স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
২য় বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ জুন ১৩-জুলাই ১৩

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস

প্রচ্ছদ ❑ মনোজ দে

বিনিময় ২০ টাকা
প্রকাশক
ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া-৭১১১০৩

মুদ্রক
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়

শরীর

ঘুম ❑ ডা. বিতান কুমার দত্ত ও ডা. সুর্য্যেন্দু বিকাশ খাটুয়া ৩
ইমাটিনিব মেসাইলেট ❑ ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য ৭
মিস্‌ক্যারেজের নানা মিথ ❑ ডা. কাঞ্চন মুখার্জি ১৩
রক্ত নিয়ে ❑ ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায় ২২
টিবি : MDR তথা XDR টিবি ❑ ডা. মতিলাল মুখোপাধ্যায় ২৯
ভোজ্যতেল নির্বাচন : কোন রান্নার তেল ব্যবহার করবেন? ❑ ডা. গৌতম মিস্ত্রি ৩১
সূর্যরশ্মি থেকে ত্বকের একটি সমস্যা ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ৪৪

মন

আপনার বাচ্চার অটিজম নেই তো? ❑ ডা. নীনা ঘোষ ২৬
মনোযোগহীন অতি-চঞ্চল বাচ্চা ❑ রুমঝুম ভট্টাচার্য ২৮
দুর্ঘটনা-উত্তর মানসিক পীড়া ❑ ডা. সুমিত দাশ ৪৬

শরীর সমাজ বিজ্ঞান

আদালত ও একটি ওষুধ— ইমাটিনিব মেসাইলেট ❑ ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত ৯
বাজারী খাদ্য এবং স্বাস্থ্যনাশকতা ❑ ড. তুষার চক্রবর্তী ১৬
এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প ❑ ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত ৩৯
আশার ছলনে ভুলি — ক্যান্সার চিকিৎসায় সাইবার নাইফ ❑ ডা. সুস্মিতা ঘোষাল ৪৮
তৃতীয়স্তর বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ❑ ডা. অনিরুদ্ধ কর ৫০
সাপ—সত্য কি? মিথ্যা কি? ❑ ডা. মৃত্যুঞ্জয় সরকার ৫৩
'সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস' কী ও কেন?❑ ডা. তাপস মণ্ডল ও চেতন গোহাল ৫৫

গল্প

ডা. প্রদীপ সরকার, এম বি বি এস ❑ প্রদীপ সরকার ৫৯

কুইজ:
অভিষেক দাস ২৫

সম্পাদকীয়

১

মৎস্য মারিব খাইব সুখে—বাঙালিমাত্রই জানেন সে সুদিন আর নেই। এখন খাবার নিয়ে ভাবার আছে। কিন্তু খাদ্য-ভাবনার গতিপথটা যে আমূল বদলে গেছে, এটা বাঙালি এখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, তা বলা যাচ্ছে না। আগে একরকম চেনা ছক ছিল—গরীব মরে না খেয়ে, রোগা হয়ে, অপুষ্টিতে। আর বড়লোক মরে বেশি খেয়ে, মোটা হয়ে, ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল উচ্চরক্তচাপ ইত্যাদি বড়লোকি অসুখে ভুগে। সুতরাং চিকিৎসকদের উপদেশ মোটামুটি ছকে বাঁধাই ছিল। গরীব রোগীকে তাঁরা বলতেন বেশি খেতে, পুষ্টিকর খাদ্য খেতে, আর 'পুষ্টিকর' খাবার মানে উচ্চ-ক্যালরি খাবার, ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য। বড়লোক রোগীদের বলতেন কম খেতে, বিশেষ করে তেল-ঘি ভাজাভুজি কম খেতে, আর খানিক ব্যায়াম করতে, ব্যাস।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে গরীবদের মধ্যেও ডায়াবেটিস কোলেস্টেরল উচ্চরক্তচাপ এইসব বড়লোকি রোগ থাবা বসাচ্ছে। আমরা তাহলে কি সবাই বড়লোক হয়ে গেলাম? সেরকম তো বলা যাবে না। কেননা বিশ্বব্যাঙ্ক নির্ধারিত মান অনুসারে, আমাদের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৩২ ভাগের ওপরই হল চরম দরিদ্র (দৈনিক ক্রয়ক্ষমতা ১.২৪ ডলারের কম), আর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশি যথেষ্ট দরিদ্র (দৈনিক ক্রয়ক্ষমতা ২ ডলারের কম)। সরকারি হিসেবেও মোটামুটি ৩০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করেন। তবে?

তবে কি আমাদের জীবনযাত্রা খাদ্যাভ্যাস এমনভাবে বদলে গেছে যে সেটা আমাদের গরীব-বড়লোক নির্বিশেষে সবার পক্ষে ক্ষতিকর? হ্যাঁ, তাই। কিন্তু কেন? আমরা কেন আমাদের খাদ্যাভ্যাস আমাদের জীবনযাপন এমনভাবে বদলে ফেলছি যেটা আমাদের নিজেদের পক্ষেই ক্ষতিকর? উত্তরটা কিঞ্চিৎ জটিল, তবে আমাদের ক্ষতি কারও কারও লাভ ঘটাচ্ছে, সেটুকু বলা যায়। এবারের স্বাস্থ্যের বৃত্তে খাদ্যাভ্যাস, ও তার সাথে সাথে জীবনযাত্রার আরেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবহেলিত দিক ঘুম, এ-দুটি নিয়েই আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

২

নোভার্টিস কোম্পানি লিউকিমিয়ার ওষুধ ইমাটিনিব মেসাইলেট 'গ্লিভেক' ব্র্যান্ডনামে ভারতে বিক্রি করে। সম্প্রতি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন, তাদের 'গ্লিভেক'-কে ভারতে নতুন ওষুধ হিসেবে 'পেটেন্ট প্রোটেকশন' দেওয়া হবে না। খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি, অন্যান্য যেসব কোম্পানি কমদামে ওই একই ওষুধ তৈরি করছিল, 'গ্লিভেক'-কে ভারতের বাজারে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিক্রি করতে হবে। আমরা সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানাই। নোভার্টিস অবশ্য এই রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারে, কিন্তু তাদের 'গ্লিভেক' অন্যান্য কোম্পানির ওষুধের তুলনায় এতোই দামি যে খুব কম ভারতীয় এই ওষুধ কিনে খেতে পারেন। এবারের স্বাস্থ্যের বৃত্তে ইমাটিনিব মেসাইলেট নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এক চিকিৎসক, আর এই আদালত-লড়াই নিয়ে লিখেছেন আর এক চিকিৎসক।

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত লেখা সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞান, বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে লেখা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার ভিত্তিতে কোনো পাঠক নিজের বা অন্যের চিকিৎসা করার চেষ্টা করবেন না। সে চেষ্টা করলে ফলাফলের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবেই সংশ্লিষ্ট পাঠকের, পত্রিকার নয়।

ঘুম

সুস্থ ও কর্মঠ জীবনযাপনের এক অন্যতম চাবিকাঠি

সারাদিনের কায়িক পরিশ্রমের শেষে বিকেলে বিশ্রাম, আর রাতে ঘুম। কিন্তু চিন্তা কেড়ে নিচ্ছে ঘুম। কারো বা রাতেই অফিস, কেউ আবার ঘুমোচ্ছেন বেশি, কেউ বা খাচ্ছেন ওষুধ। কিন্তু ভেবে দেখেছেন আমাদের ঘুমের অভ্যাস সঠিক কিনা? সত্যিই কি ওষুধ সবসময় দরকার? তাহলে, কখন ঘুমের জন্য ডাক্তার দেখাব? ঘুম সম্পর্কিত এমনই নানাবিষয়ে আলোকপাত করেছেন **ডা. বিতান কুমার দত্ত ও ডা. সূর্য্যেন্দু বিকাশ খাটুয়া**।

"ভগবান নিদ্রা দিয়েছেন, গোলযোগ সইতে পারেন না।" ব্যক্তিগতভাবে ভগবানে বিশ্বাস না করলেও ছোটবেলা থেকেই এই কথাটি শুনে আসছি। আপনারও নিশ্চয়ই শুনেছেন। তা এখন প্রশ্ন হল, অদৃশ্য ভগবান না হয় ঘুমালে গোলযোগ সইতে পারেন না, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ পারে কি? মায়েরা সুরেলা বা বেসুর কণ্ঠে মিষ্টি গান গেয়ে বাচ্চাদের ঘুম পাড়ান। আবার নতুন প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা অনেকে ঘুমানোর সময় মোবাইলে গান চালিয়ে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন। অনেক সময় দেখা যায়, একই সময় যাবৎ রাতে ঘুমিয়েও কোনদিন সকালে উঠে চাঙ্গা লাগে, আবার কোনদিন ঝিমুনিভাব থাকে। ঘড়ি বা মোবাইলে অ্যালার্ম দিয়ে যদি অ্যালার্ম বাজার সাথে সাথে উঠে পড়ি, তাহলে মনে হয় আজকে ভালোই ঘুম হল। সত্যিই কি হল? বিজ্ঞানীরা বলছেন, সারাদিন ঠিকমত কাজ করার জন্য রাতে সঠিকভাবে গড়ে ৮ ঘন্টা ঘুম দরকার। আবার অনেকে, এমনকি অধিকাংশ চিকিৎসকও বলেন, ৬ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট। তাহলে কোন্‌টা ঠিক? সারাদিন ফালতু সময় নষ্ট করার পর রাতের ঘুমকে প্রাধান্য না দিয়ে অবশিষ্ট কাজগুলোকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি আমরা। কারণ ঘুম সম্বন্ধে অশিক্ষিত থেকে শিক্ষিতবর্গের সমস্ত মানুষেরই, এমনকি ডাক্তারদেরও সম্যক ধারণার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই, আসুন আমরা জেনে নিই, ঘুম আমাদের জীবনে কতটা, কিভাবে, কেন এবং কতক্ষণ জরুরী। এছাড়াও আমাদের বিভিন্নরকম কর্মব্যস্ততা, দৈনিক কর্মনির্ঘন্টের মধ্যেও পরিমিত ঘুমের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে, সেবিষয়েও দিশা দেওয়ার চেষ্টা করব এই আলোচনায়।

ঘুম কেন প্রয়োজনীয়?

আমরা অনেকেই কম ঘুমানোর চেষ্টা করি বা অন্ততপক্ষে কম ঘুমানো উচিত বলে মনে করি। মনে রাখবেন, সুস্বাস্থ্য ও সুখের জন্য যেমন শরীরচর্চা ও পুষ্টির প্রয়োজন, ঠিক একইভাবে পরিমিত ঘুমেরও প্রয়োজন আছে। কতক্ষণ ঘুমোচ্ছেন তার থেকে বেশী প্রয়োজন আপনার ঘুমের গুণমানের (Quality of sleep) উপর বেশী নজর দেওয়া। বলা হয়, মানুষের মানসিক বিচক্ষণতা, উৎপাদনশীলতা, আবেগ, সৃজনশীলতা, শারীরিক স্থিতাবস্থা, এমনকি আপনার শরীরের ওজন এসব কিছুর উপর ঘুমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। ঘুমের মতো আর কোনও কিছুতেই কিন্তু এত কম প্রচেষ্টায় এতসব উপকার পাওয়া যায় না।

কতক্ষণ ঘুমোচ্ছেন তার থেকে বেশি প্রয়োজন আপনার ঘুমের গুণমানের (Quality of sleep) উপর বেশি নজর দেওয়া।

আমরা সাধারণভাবে মনে করি, আমরা যখন ঘুমাই, তখন আমাদের শরীর ও মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ রাখে। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভুল। বরং বলা যেতে পারে, ঘুমের সময় আমাদের মস্তিষ্ক ব্যস্ত থাকে ও একসাথে অনেকগুলি জৈবিক ক্রিয়াকলাপের রক্ষণাবেক্ষণ (maintain) করে, যার ফলে আমাদের শরীর খুব ভালো অবস্থায় থাকে এবং পরবর্তী দিনের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। যদি ঠিকমত ঘুম না হয়, তাহলে আপনি কখনোই নিজের কর্মক্ষমতা বা যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন না, যদিও কোন একদিনের নিম্নমানের কর্মদক্ষতাকে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের ব্যর্থতা বা অপদার্থতা বলে ধরে নিই। যদি দেখা যায়, রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুমের পরও আপনার সারাদিন জেগে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে, আপনার ঘুমের বিভিন্ন স্তরে আপনি যথাযথ সময় অতিবাহিত করেননি। তাই, ঘুমের সঠিক পরিমাণ ও গুণমান বজায় রাখতে জেনে নিন নিদ্রাচক্রের (sleep cycle) স্তরগুলি কী কী, ঘুম সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি কী, আমাদের কতক্ষণ ঘুমানো উচিত ও আমাদের শরীরে আহ্নিক চক্র (circadian rhythm) কিভাবে চলে।

নিদ্রাচক্রের স্তরবিন্যাস (stages of sleep cycle) :

সম্পূর্ণ নিদ্রাচক্র ৯০-১২০ মিনিট (গড়ে ৯০ মিনিট)। দুটি মূল ভাগ, যথা—

(১) নন্‌-আর.ই.এম. ঘুম (NREM Sleep) : এর আবার চারটি স্তর রয়েছে, যার প্রত্যেকটি তার পূর্ববর্তী স্তরের চেয়ে গভীরতর।

(২) আর.ই.এম. ঘুম (REM—Rapid Eye Movement Sleep) : এই সময়েই আমরা স্বপ্ন দেখি। প্রকৃতপক্ষে চোখ এই সময়ে সামনে পিছনে ঘুরতে থাকে বলে এই স্তরের এরকম নামকরণ হয়েছে।

Non-REM Sleep (৭০-৯০ মিনিট)

- স্তর ১ (ঘুম পাওয়া বা তন্দ্রাচ্ছন্নতা—transition to sleep) :এটি ৪-৫ মিনিটের স্তর। এসময় চোখের গোলক বা eyeball-টি আস্তে নড়াচড়া করে ও আমাদের পেশীগুলি সক্রিয়ভাবে স্তিমিত হতে থাকে। এসময়ে জেগে যাবার সম্ভাবনা প্রবল।
- স্তর ২ (হাল্কা ঘুম—light sleep) : প্রকৃত ঘুমের ১ম স্তর এটিই। ১০-২৫ মিনিট পর্যন্ত থাকে। চোখের বিচলন বন্ধ থাকে এবং হৃদগতি (heart rate) ও দৈহিক তাপমাত্রা কমতে থাকে।
- স্তর ৩ ও ৪ (গভীর ঘুম–deep sleep) : এই সময় কাউকে জাগানো খুব কঠিন ব্যাপার। যদিও বা কেউ জেগে যায়, তবে খানিকক্ষণ যাবৎ টলমলে ভাব বা disoriented অনুভব করেন অর্থাৎ চারপাশের ব্যাপার-স্যাপার তাঁর বুদ্ধিতে যেন পুরো ধরা দেয় না। এই স্তরে রক্ত সঞ্চালন মস্তিষ্কের তুলনায় পেশীতে বেশি হয় বলে আমরা শারীরিক শক্তি ফিরে পাই। তাই এই স্তরের ঘুম কম হলে আপনি পরবর্তী দিনে কাজ করার উৎসাহ উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলবেন ও শারীরিক বৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

REM Sleep (২০ মিনিট)

এই স্তরকে dream sleep বা স্বপ্নময় স্তরও বলা হয়ে থাকে, কারণ এই সময়েই আমরা স্বপ্ন দেখে থাকি, চোখের বিচলন বেড়ে যায়, হৃদ্স্পন্দন ও রক্তচাপ বেড়ে যায়। এছাড়াও আমাদের হাত-পা-এর পেশীগুলি নিশ্চল (paralyzed) হয়ে থাকে। এই সময়ে আমাদের মস্তিষ্ক সারাদিনের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বা তথ্যগুলিকে একজায়গায় করে সংগঠিত করে ও অপ্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে সরিয়ে দেয়। ফলে আমাদের শিক্ষা ও স্মৃতিশক্তি উন্নততর হয়। তাই শিক্ষা, স্মৃতি, একাগ্রতা এইসবের জন্য ঘুমের এই স্তরের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তি তাঁর মোট ঘুমের ৫০ শতাংশ সময় দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ হাল্কা ঘুমে কাটান, ২০ শতাংশ সময় REM ঘুমে ও বাকি সময় Non-REM গভীর ঘুমে কাটান।

নিদ্রা জাগরণ চক্র (Sleep-awake cycle) **কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?**

আমাদের শরীরের মধ্যে ২৪ ঘন্টা যাবৎ যে নিদ্রা-জাগরণ চক্র কাজ করে তাকে শারীরবিজ্ঞানের জৈবিক ঘড়ি (biological clock) বা আহ্নিক চক্র (circadian rhythm) -ও বলা হয়ে থাকে। এই চক্রটি মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা মূলত আমরা কতক্ষণ জেগে আছি এবং দৈনিক আলো ও অন্ধকার সময়ের অনুপাত-এর উপর নির্ভর করে কাজ করে।

মেলাটোনিন আমাদের শরীরের একটি হর্মোন যা আপনাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হতে সাহায্য করে। রাত্রিবেলায় যখন দিনের আলো থাকে না, তখন শরীরে মেলাটোনিন তৈরী হয়। তাই আমাদের রাত্রিবেলায় ঘুম পায়। দিনের বেলার সূর্যালোক আমাদের মস্তিষ্ককে মেলাটোনিন উৎপাদন বন্ধ করার উদ্দীপনা দেয়, তাই দিনে আমরা সজাগ ও সতর্ক থাকি।

এই চক্রটি ব্যাহত হলে আমাদের ঘুমের ঘাটতি হয়। নিম্নলিখিত কারণে এই চক্রটি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে-

১। রাত্রিকালিন কর্মক্ষেত্রের কাজ (Nightshift work)

২। অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাস।

৩। দিনের বেলা সূর্যরশ্মিহীন স্থানে বেশিক্ষণ থাকা (বিশেষত আধুনিক অফিসগুলিতে)।

৪। রাত্রে অধিকমাত্রায় কৃত্রিম আলোর মধ্যে থাকা।

আমাদের দৈনিক ঘুমের প্রয়োজনীয় মাত্রা

ঘুমের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামান্য। অধিকাংশ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দৈনিক

অধিকাংশ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির দৈনিক কমপক্ষে ৭.৫ ঘন্টা থেকে ৯ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন।

কমপক্ষে ৭.৫ ঘন্টা থেকে ৯ ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন। রাত্রিবেলা অনেকক্ষণ ঘুমানো সম্ভব না হলে বয়স্কদের দুপুরের ছোট ঘুম (nap) খুব উপকারী।

বয়স	প্রয়োজনীয় ঘুমের মাত্রা
সদ্যোজাত (০-২ মাস)	১২-১৮ ঘন্টা
Infant (৩মাস-১ বছর)	১৪-১৫ ঘন্টা
Toddlers (১-৩ বছর)	১২-১৪ ঘন্টা
Preschoolers (৩-৫ বছর)	১১-১৩ ঘন্টা
School-aged (৫-১২ বছর)	১০-১১ ঘন্টা
Teens & Preteens (১২-১৮ বছর)	৮.৫-১০ ঘন্টা
প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের উর্দ্ধে)	৭.৫-৯ ঘন্টা

যদি আপনি ৭ ঘন্টা ঘুমিয়ে ওঠার পর আপনার কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারেন তবে এটা মনে করার দরকার নেই যে, আরো এক বা দু-ঘন্টা বিছানায় পড়ে থাকলে বা ঘুমালে আপনার কাজ আরো ভালো হত। তাই আপনার কতক্ষণ ঘুমালে দৈনিক কাজকর্ম সবচেয়ে ভালো সেটা বুঝতে গেলে কমপক্ষে সাতদিন যাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার—প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া ও রোজনামচা তৈরী করে তার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

৬ ঘন্টা ঘুম কি যথেষ্ট?

না, এই ব্যাপারে একটি তথ্য দেওয়া যাক। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, কিছু মানুষের শরীরে একটি দুষ্প্রাপ্য জিন (Gene) থাকে যা তাদের ৬ ঘন্টা ঘুমের পরও প্রতিদিন সবচেয়ে ভালোভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়। কিন্তু এই মানুষেরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ। তাই বাকী ৯৭ শতাংশ মানুষের জন্য দৈনিক ৬ ঘন্টা ঘুম কখনোই যথেষ্ট নয়।

ঘুম সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি

১। প্রতিরাতে ১ ঘন্টা কম ঘুমালে দিনের বেলা কাজ করতে অসুবিধা হয় না।
রাতে ১ ঘন্টা কম ঘুমের জন্য দিনের বেলা যদি ঘুম-ঘুমভাব নাও থাকে, তবুও চিন্তাশক্তি, দৈহিক শক্তির ভারসাম্য, রোগপ্রতিরোধের ক্ষমতা ব্যাহত হয়।

২। সপ্তাহান্তে বেশি ঘুমিয়ে নিলেই সাপ্তাহিক ঘুমের ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে।
এই প্রক্রিয়ায় আংশিকভাবে ঘুমের ঘাটতি পূরণ হয়, পুরোটা কখনোই হয় না।

৩। রাত্রে অতিরিক্ত ঘুমোলেই দিনের অত্যাধিক ক্লান্তি মিটে যাবে।

আমরা জানি না বা জানলেও ভুলে যাই যে, সফলভাবে কাজ করা ও দৈনিক ক্লান্তি দূর হওয়ার জন্য দৈনিক ঘুমের পরিমাণ ও গুণমান (Quantity & Quality) দুইয়ের দিকেই নজর রাখা দরকার। আর তাই অনেক সময় বেশি ঘুমিয়েও সকালে উঠে আমরা হয় টলতে থাকি নয় বসে বসে ঝিমোতে থাকি।

আপনার ঘুম কম হচ্ছে কিনা যে ঘটনাগুলির দ্বারা বুঝবেন :

(ক) সকালে ওঠার জন্য নিয়মিত অ্যালার্ম (Alarm) দিতে হয়।
(খ) সকালে উঠতে গেলে মোবাইলের 'স্নুজ' বোতাম (snooze button) এর উপর নির্ভর করতে হয়।
(গ) বিছানায় শোয়ার ৫ মিনিটের মধ্যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েন।
(ঘ) মিটিং বা লেকচার ক্লাসে ঘুম পাওয়া।
(ঙ) সন্ধ্যাবেলায় টেলিভিশন দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়া।
(চ) সকালে ঘুম থেকে উঠতে প্রবল কষ্ট হওয়া।
(ছ) ভারী খাবার খাওয়ার পর ঘুম পাওয়া।
(জ) বিকেলবেলায় নড়াচড়া করতেও যেন অনীহা।
(ঝ) সপ্তাহান্তে অধিক ঘুমের প্রয়োজন অনুভব করা। (মনে রাখবেন, ঘুম কম হওয়া মানেই সবসময় 'অনিদ্রা' রোগ নয়।)

বহুদিন যাবৎ কম ঘুমানোর ফলে যা যা হতে পারে—

- ক্লান্তি, কোনকাজে উৎসাহ না পাওয়া।
- মানসিক তিক্ততা।
- ওজনবৃদ্ধি।
- সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- মানসিক চাপ সহ্য করতে না পারা বা মোকাবিলা করতে না পারা।
- একাগ্রতার অভাব।
- দুর্ঘটনার প্রবণতা বৃদ্ধি।
- সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- শরীরে অনাক্রম্যতা (Immunity) কমে যাওয়া।
- শরীর ও স্বাস্থ্যের সামগ্রিক অবনতি।

ভালো ঘুমের অভ্যাস তৈরী করবেন কিভাবে?

প্রতিরাতে ভালোভাবে ঘুমানোর জন্য ভালোভাবে নীতি-নির্ধারণ করা জরুরী। যদিও এর মূল চাবিকাঠিই হল প্রথমে এক বা দু' সপ্তাহ যাবৎ কিছু নিয়ম মেনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। শিখতে হবে ঘুমের ব্যাঘাতকারী জিনিসগুলি থেকে পরিত্রাণের উপায়, কিছু ঘুম পাওয়ার শৈলী (sleep-promoting techniques), আর এর মাধ্যমে আপনি নিজেই নিজের একটি 'গুডনাইট 'ঘুম'-এর প্রেসক্রিপশান বানিয়ে ফেলতে পারেন কিছু ঘুমের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (sleep hygeine) মেনে। যথা ঃ-

১। ঘুমের জন্য নির্দিষ্ট সময়পঞ্জী মেনে চলুন

(ক) রোজ রাতে নির্দিষ্ট সময় নির্ঘন্ট মেনে ঘুমাতে যান।
(খ) প্রতিদিন সকালে একই সময়ে উঠে পড়ার চেষ্টা করুন।
(গ) রাতের ঘুম কম হয়ে থাকলে, সম্ভব হলে দিনে অল্প করে ঘুমিয়ে নিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করে ফেলার চেষ্টা করুন।

প্রতিরাতে ভালোভাবে ঘুমানোর জন্য ভালোভাবে নীতি-নির্ধারণ করা জরুরী।

(ঘ) যদি 'অনিদ্রা' রোগ হয়ে থাকে, তবে বিকেলের ঘুমকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। না হলে, অনিদ্রা রোগ আরও বাড়তে পারে।
(ঙ) রাতের খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই ঘুমাবেন না, যদি ঘুম পায় তাহলে সামান্য কিছু কাজ করুন।

২। আপনার নিদ্রা-জাগরণ চক্র (sleep-awake cycle) **কে প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করুন**: দিনে অধিক সূর্যালোক পেতে-

(ক) 'সানগ্লাস' (sunglass) পড়বেন না।
(খ) দিনের বেলায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকুন।
(গ) নিজের ঘরবাড়ি ও কর্মক্ষেত্র যথাসম্ভব আলোক উজ্জ্বল (স্বাভাবিক আলো) রাখুন।

রাতে 'মেলাটোনিন' উৎপাদন বাড়াতে (অর্থাৎ ঘুম পাওয়াকে ত্বরান্বিত করতে)—

(ক) টেলিভিশান বা কম্পিউটার চালিয়ে হাল্কা হওয়ার (relax) বৃথা চেষ্টা করবেন না। বরং এতে উল্টোটাই ঘটবে। হাল্কা গান শুনুন বা বই পড়ুন।
(খ) ঘুমাতে যাওয়ার আগে উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে রাখবেন না। আইপ্যাড বা মোবাইল পড়ার কাজে ব্যবহার করবেন না।
(গ) ঘুমানোর সময় ঘর অন্ধকার করে রাখবেন অবশ্যই। নাইটবাল্ব জ্বালিয়ে রাখবেন না। প্রয়োজনে টর্চ সাথে রাখুন।

ঘুমানোর সময় ঘর অন্ধকার করে রাখবেন অবশ্যই।

(৩) আপনার ঘরকে নিদ্রাসুলভ (sleep friendly) করে তুলুন :

(ক) চারিদিকের আওয়াজ থেকে মুক্ত রাখুন।
(খ) যদি কুকুরের ডাক, রাস্তার যানবাহনের অত্যাধিক আওয়াজে অসুবিধা হয়, তবে একটি ফ্যান বা সুরেলা গান চালিয়ে রাখুন। কানে প্লাগও ব্যবহার করতে পারেন।
(গ) শোবার ঘরকে ঠান্ডা রাখুন।
(ঘ) আপনার ঘুমের উপযুক্ত তোষক, গদি ও বালিশ ব্যবহার করুন, যাতে আপনি আরাম অনুভব করেন।
(ঙ) বিছানাকে কেবলমাত্র ঘুম ও যৌনক্রিয়ার জন্যই ব্যবহার করুন।

(৪) রাতে পরিমিত খাওয়া ও নিয়মিত শরীরচর্চা করুন

(ক) রাতে ভারীমাত্রায় খাওয়া-দাওয়া করবেন না।
(খ) ঘুমাতে যাওয়ার আগে মদ্যপান করবেন না। অনেক সময় মনে হতে পারে, মদ্যপানে ভালো ঘুম আসে। কিন্তু মদ্যপানে তাড়াতাড়ি ঘুম আসলেও, ঘুমের গুণমান কমে এবং শেষরাতে জেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবলভাবে বেড়ে যায়।
(গ) শুনলে অবাক হবেন, ক্যাফেইন (Caffeine) সমৃদ্ধ পানীয় কফি, চা, কোলা খাওয়ার ১২ ঘন্টা পর পর্যন্ত ঘুমের অসুবিধা হয়। তাই মধ্যাহ্নভোজনের পর ক্যাফেইন সমৃদ্ধ পানীয় না খাওয়াই শ্রেয়।
(ঘ) রাতে বেশি পানীয় (যেমন জল, ফলের রস, চা ইত্যাদি), ধূমপান করবেন না, না হলে ঘুম আসবে না।
(ঙ) নিয়মিত শরীরচর্চা মানে ব্যায়াম বা যোগাসন নয় সবসময়, হাল্কা যোগাসন করা যেতেই পারে। তবে গৃহস্থালি বা পরবর্তী দিনের কিছু কাজ গুছিয়ে রাখার মাধ্যমেও প্রয়োজনীয় শরীরচর্চা হয়ে যেতে পারে।

(৫) দুশ্চিন্তা ও মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন : মানসিক চিন্তা বা চাপের জন্য যদি প্রতিরাতে ঘুম ভেঙে যায়, সেক্ষেত্রে চেষ্টা করুন যে ঘটনা আপনাকে ঘুমাতে দিচ্ছে না সেটি একটি খাতায় লিখে রাখার। নতুবা 'চাপ নিয়ন্ত্রণ' (stress management) পদ্ধতি শিখুন।

(৬) 'রিলাক্সেশান পদ্ধতি' (Relaxation Techniques) শিখুন :

ভালো ঘুমের জন্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই উপকারী। যেমন :

(ক) চোখ বন্ধ গভীরভাবে শ্বাস নিন ও আস্তে আস্তে ছাড়ুন।

(খ) ক্রমান্বয়ে পা থেকে শুরু করে শরীরের উর্ধ্বাংশের পেশীগুলি একবার শক্ত করুন ও তারপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিন।

(গ) চোখবন্ধ করে কোন শান্ত-স্নিগ্ধ জায়গা বা শান্তিপূর্ণ কাজকে ভাবার চেষ্টা করুন, যা আপনাকে হাল্কা করে।

(৭) রাতে ওঠার পর আবার ঘুমাতে যাওয়া।

খুব স্বাভাবিকভাবে মাঝেমধ্যেই রাতে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। যদি আপনার ঘুম ভালো হয়, তবে আপনার ঐ ঘুম ভেঙে যাওয়াকে সকালে উঠে মনে করতে পারবেন না। কিন্তু যদি একবার ঘুম ভাঙার পর রাতে আর ঘুম না আসে, তবে নিচের পদ্ধতিগুলি প্রপ্ত করুন।

(ক) পুনরায় বিছানায় আরাম করে শুয়ে পড়ুন।

(খ) 'ঘুম আসছে না কেন?' এই ভেবে নিজেকে ব্যস্ত করবেন না।

(গ) চেষ্টা করুন চোখ বন্ধ করে হাল্কা হতে, ঘুম আপনিই আসবে।

(ঘ) কোন অহেতুক চিন্তা বা কাজ ঘুম আসতে না দিলে সেটি খাতায় লিখে রাখুন - পরদিন সকালে উঠে তার সমাধান অনেক ভালোভাবে করতে পারবেন।

(৮) রাত্রিকালিন কাজের সাথে মানিয়ে ওঠা : এক একদিন এক এক সময়ে শিফট

(ক) কর্মক্ষেত্রে রাত্রিকালীন কাজ বা Irregular shift ডিউটির সংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখুন।

(খ) রাত্রে কাজের পর দীর্ঘক্ষণ দিবালোকে থেকে অনেক পথ চলা এড়ানোর চেষ্টা করুন।

(গ) কাজের 'শিফ্‌ট' শুরুর সময় ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় খেতে পারেন কিন্তু শেষের দিকে খাবেন না।

(ঘ) রাতের কাজের মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরে আসুন বা হাল্কা কিছু ব্যায়াম করুন।

(ঙ) কাজ থেকে ফিরে ঘুমানোর সময় শোবার ঘরে দিনের আলো ও আওয়াজ যথাসম্ভব কম রাখার চেষ্টা করুন এবং ফোন বন্ধ রাখুন।

(চ) সপ্তাহান্তে অপূর্ণ ঘুমের ঘাটতি খানিকটা হলেও মেটানোর চেষ্টা করবেন।

ঘুমের ঘাটতি পূরণ :

আপনার প্রত্যেকবারের ঘুমের ঘাটতি ক্রমান্বয়ে জমতে থাকে। তাই অনেকদিনের ঘুমের ঘাটতি শারীরিক ও মানসিক দু'ভাবেই সমস্যাদায়ক। আবার, আমরা অনেকেই সপ্তাহান্তে বেশি ঘুমিয়েই এই ঘাটতি সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করি। দেখা যাক, কী কী ভাবে ঘুমের ঘাটতিকে ক্রমান্বয়ে মিটিয়ে ফেলা যায়---

(১) প্রতিরাতে কমপক্ষে সাড়ে সাত ঘন্টা ঘুমান।

(২) প্রতিরাতে এক-দু'ঘন্টা করে ঘাটতি মেটান।

(৩) কখনো ছুটি পেলে আনন্দের সাথে ঘুমের ঘাটতি মেটানোর দিকেও খেয়াল রাখুন।

(৪) অন্যান্য সব কাজের মত ঘুমকেও প্রাধান্য দিন।

যদি আপনি এত সবকিছু আপনার ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগের পরও ঘুম নিয়ে সমস্যায় থাকেন তবে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত, প্রয়োজনে ওষুধও নেওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে আপনি ডাক্তারের সাহায্য নিন ঃ

১। রাতে ঘুমানোর সময় জোরে নাক ডাকা,

২। অনেকদিন ধরে দিনের বেলায় ঘুম পাওয়া ও ক্লান্তি।

৩। ঘুম পেতে ও ঘুমিয়ে থাকতে অসুবিধা।

৪। মাঝেমাঝেই ঘুম থেকে উঠে মাথাযন্ত্রনা।

৫। ঘুমের মধ্যে চলে ফিরে বেড়ানো।

৬। যখন-তখন ঘুম পাওয়া বা ঘুমিয়ে পড়া।

সবশেষে বলা দরকার, ঘুমের ঘাটতি মানেই কিন্তু 'অনিদ্রা' নয়। অন্যান্য অভ্যাসের মত ঘুমেরও একটি সঠিক অভ্যাস তৈরী করা প্রয়োজন। ক্রমবর্দ্ধমান পড়াশুনার চাপ, দারিদ্র, মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্তের অধিক অর্থ উপার্জনের নেশা, বেকারত্ব বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের দেশ সহ সারা পৃথিবীজুড়ে যে মানসিক

ঘুমের ঘাটতি মানেই কিন্তু 'অনিদ্রা' নয়।

চাপ মানুষের ওপর সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বদলাচ্ছে মানুষের ঘুমের অভ্যাস, বাড়ছে অনিদ্রা ও অন্যান্য মানসিক রোগ, যার থেকে পরিত্রাণের উপায় কখনোই ওষুধ খাওয়া নয়, বরং নিয়মমাফিক একটি অভ্যাস মেনে চলা।

তথ্যসূত্র :

1. Your guide to Healthy Sleep (PDF) - The National Institute of Health.
2. Improving Sleep : A guide to a Good Night's Rest - A special health report published by Harvard Health Publication.
3. Helpguide. org. (Last updated January 2013).
4. Sleep Hygiene : Helpful Hints to Help You sleep (University of Maryland Medical Center).
5. Healthy Sleep Tips (National Health Foundation).
6. Twelve Simple Tips to Improve your Sleep (Healthy Sleep. Harvard Medical School).
7. Effects of Sleep Deprivation (Stanford Sleep & Dreams).
8. Consequence of Insufficient Sleep (Healthy Sleep website).
9. Can you catch up on Lost Sleep? (Scientific American).
10. Brain Basics : Understanding Sleep (National Institute of Neurological Disorder and Stroke).

লেখক পরিচিতি : ডা. বিতান কুমার দত্ত, এম বি বি এস এবং ডা. সূর্য্যেন্দু বিকাশ খাটুয়া, এম বি বি এস, মনোরোগ বিভাগে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। বর্তমানে দুজনেই শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত এক স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে যুক্ত।

ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়ার ম্যাজিক ওষুধ

ইমাটিনিব মেসাইলেট

'টাইম' ম্যাগাজিনের ভাষা ধার করে ইমাটিনিব মেসাইলেট-কে 'ক্যানসারের ম্যাজিক বুলেট' বলে আখ্যা দিতে হয়তো আমাদের সবার সায় থাকবে না, কিন্তু ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া-র রোগীদের অবধারিত মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরিয়েছে এই ওষুধ—**লিখছেন ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য।**

আজ থেকে বছর পঁচিশ-তিরিশ আগে আমাদের ডাক্তারি জীবনের প্রথমদিকে আমরা এক ধরণের বিরল লিউকিমিয়া (ব্লাড ক্যানসার) দেখতাম—ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া। সাধারণত এইসব রোগীরা বিরাট বড় পিলে বা প্লিহা (spleen) নিয়ে আসতেন, আর রক্তপরীক্ষা করে দেখতাম রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা খুব বেশি—দেড় লাখ থেকে আড়াই লাখ (প্রতি ঘন-মিলিমিটারে), যেখানে স্বাভাবিক সংখ্যাটা হল চার হাজার থেকে এগারো হাজার। আমরা জানতাম তাঁদের আয়ু বেশিদিন নয়। বুসালফান (Busulfan, 1950 সালে আবিষ্কৃত) আর হাইড্রক্সিইউরিয়া (Hydroxyurea) দিয়ে তাঁদের চিকিৎসা করতাম, কিন্তু এই ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল খুব বেশি, আর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল যে এরা কেউই রোগের মূল কারণ দূর করতে পারত না। পরে আসে ইন্টারফেরন (Interferon) নামে ওষুধটি; সেটা এদের চাইতে বেশি কার্যকর হলেও রোগের মূলে গিয়ে কাজ করত না, আর ইঞ্জেকশন দিয়ে ইন্টারফেরন দিতে হত, ফলে রোগীদের পক্ষে তা ছিল এক কষ্টকর অভিজ্ঞতা।

রোগের মূল কারণ :

ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়ার আধুনিক ইতিহাসের শুরু আমরা ধরতে পারি ১৯৬০ সালে, যখন এই রোগের জেনেটিক অস্বাভাবিকতাটি চিহ্নিত করেন দুই বিজ্ঞানী— নোয়েল (Peter Nowell) ও হাঙ্গারফোর্ড (David Hungerford)। তাঁরা আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে এই জেনেটিক অস্বাভাবিকতাটি আবিষ্কার করেন, আর তার নাম দেন 'ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোসোম' (Philadelphia chromosome)। দুই বিজ্ঞানী এই আবিষ্কারের ফলে নোবেল প্রাইজ পান।

মানুষের শরীরে অজস্র কোষের প্রায় প্রতিটির মধ্যে আছে একটি করে নিউক্লিয়াস। সেই নিউক্লিয়াসে থাকে ২৩ জোড়া 'ক্রোমোসোম'। ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া রোগীদের প্রায় প্রত্যেকের শ্বেতরক্তকণিকায় ৯ নম্বর ক্রোমোসোম আর ২২ নম্বর ক্রোমোসোমের মধ্যে অংশবিনিময় (পরিভাষায় বললে Translocation) হয়। ক্রোমোসোমে থাকে আমাদের সমস্ত জিন, আর এই অংশবিনিময়ের ফলে নতুন জিন (Fusion

Gene) তৈরি হয়। এই নতুন জিন তৈরি করে একধরনের প্রোটিন, উৎসেচক টাইরোসিন কাইনেজ-এর একটা অস্বাভাবিক ধরন, যেটা অবিরাম অনিয়ন্ত্রিত কোষ-বিভাজন ঘটায়। স্বাভাবিক টাইরোসিন কাইনেজ দেহের অন্য নানা প্রোটিন-এর নিষেধাজ্ঞা মেনে কাজ থামিয়ে দেয়, কিন্তু এই অস্বাভাবিক টাইরোসিন কাইনেজ সেসব নিষেধাজ্ঞা মানে না।

ইমাটিনিব মেসাইলেট আবিষ্কার :

এই অস্বাভাবিক টাইরোসিন কাইনেজ-কে নিষ্ক্রিয় করার মতো ওষুধ তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন। ইমাটিনিব মেসাইলেট হল সেই প্রচেষ্টার খুব সফল এক ফসল। প্রসঙ্গত, চিকিৎসাশাস্ত্রে এরকম নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে বদলানোর চেষ্টা (Targeted Therapy) অনেক হয়েছে, কিন্তু ইমাটিনিব মেসাইলেট হল প্রথম সত্যিকারের সফল ওষুধ যা এইভাবে কাজ করে। ফলে ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়।

নোভার্টিস কোম্পানির বায়োকেমিস্ট্রি গবেষক নিকোলাস লাইডন (Nicholas Lydon) এবং অন্য অনেক গবেষক মিলে ইমাটিনিব মেসাইলেট আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন স্তরে ট্রায়ালের পর আমেরিকার ওষুধ-নিয়ন্ত্রণ দপ্তর (FDA) খুব কম সময়ের মধ্যে একে ছাড়পত্র দেয়। ২০০১ সালের মে মাসে FDA ছাড়পত্র পাবার সাথে সাথে বিখ্যাত 'টাইম' ম্যাগাজিন প্রচ্ছদ-নিবন্ধ হয়ে উঠল এই ওষুধ—ক্যানসারের 'ম্যাজিক বুলেট' বলে একে আখ্যা দিল 'টাইম'।

ক্যানসারের 'ম্যাজিক বুলেট' হোক বা না হোক, ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়ার চিকিৎসার চালচিত্রটাই পালটে দিল ইমাটিনিব। 'IRIS' ট্রায়াল-এ রোগীদের ওপর ইমাটিনিব মেসাইলেট ও ইন্টারফেরন (ইমাটিনিব-এর আগে সবচেয়ে কার্যকর ওষুধ)—এই দুটো ওষুধের তুলনামূলক পরীক্ষা করে দেখা হয়। মোট ১১০৬ জন ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়ার রোগীর ওপর পরীক্ষা হয়, তাঁদের এক অংশকে ইমাটিনিব মেসাইলেট ও বাকিদের ইন্টারফেরন দেওয়া হয়। পাঁচ বছর পরে দেখা যায় ইন্টারফেরন দিয়ে যাঁদের চিকিৎসা হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ জীবিত আছেন ও ওষুধ চালিয়ে যাচ্ছেন, আর ইমাটিনিব মেসাইলেট দিতে যাদের চিকিৎসা হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে ৬৯ শতাংশ ওষুধ চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং তাঁদের শতকরা ৮৭-৯০ রোগীর ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোসোম আর পাওয়া যাচ্ছে না (Philadelphia chromosome negative)। ৮ বছর পরেও দেখা গেল ইমাটিনিব পাওয়া রোগীদের ৮৫ শতাংশ জীবিত রয়েছেন। কেউ এতোটা আশাই করেন নি, আর এর একটা অদ্ভুত 'পার্শ্বক্রিয়া' দেখা গেল— যে ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া রোগ হিসেবে খুব বিরল ছিল, যে অসুখের ওষুধ তেমন বিক্রি হত না, এখন সেই রোগ আর বিরল রোগ নেই, আর সে-রোগের ওষুধের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে! কেন বলুন তো? আগে এই রোগীরা রোগ ধরা পড়ার পরে বাঁচতেন অল্পদিন, ফলে যে কোনও সময়ে সংখ্যার বিচারে তাঁরা অল্প থাকতেন, সুতরাং 'বিরল রোগ' তকমা। কিন্তু এখন

যত দিন যাচ্ছে, এ-রোগের পুরনো রোগীরা তো থাকছেনই, সাথে নতুন রোগীরা যোগ দিচ্ছেন, ফলে এটা আর বিরল রোগ নয়, আর এই রোগের ওষুধ ইমাটিনিব-এর চাহিদা তাই দিন-কে-দিন বেড়েই চলেছে। রহস্য করে বলা হয়, ইমাটিনিব লিউকিমিয়া রোগ-এর প্রাদুর্ভাব বাড়িয়ে দিয়েছে!

ইমাটিনিব মেসাইলেট-এর সুবিধা অসুবিধা:

ইমাটিনিব মেসাইলেট ট্যাবলেট হিসেবে পাওয়া যায়, ফলে রোগীর সুবিধা। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আগের ওষুধগুলোর তুলনায় অনেক কম। শরীরে জল জমে মুখ বা পা ফুলতে পারে, ডাইরিয়া, গাঁটে ব্যথা, চামড়ায় র‍্যাশ, এবং রক্তে হিমোগ্লোবিন ও বিভিন্ন রক্তকণিকা কমে যাওয়া—এসব হতে পারে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে এই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অস্থিমজ্জা স্থায়িভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় ও রক্তকোষ তৈরি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়—একবার এরকম হয়ে গেলে ওষুধ বন্ধ করেও আর অস্থিমজ্জাকে ঠিক করা যায় না। তবে গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া খুব বেশি রোগীর ক্ষেত্রে হয় না।

এর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হল, শতকরা ২৫ ভাগ রোগীর এই ইমাটিনিব-এ কাজ করে না, আমরা বলি প্রাইমারি রেজিস্ট্যান্স। আর যাঁদের কাজ করে তাঁদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে কিছুদিন পরে এই ওষুধ কার্যকারিতা হারায়, আমরা বলি সেকেন্ডারি রেজিস্ট্যান্স।

আরেকটা অসুবিধা হল, ইমাটিনিব দিয়ে কোনও রোগীর রোগ কমে গেলেও সেরে যায় না। ফিলাডেলফিয়া ক্রোমোসোম নেগেটিভ হয়ে গেলেও ওই ওষুধ চালিয়ে যেতে হয়। এই ওষুধ বেশ ব্যয়সাপেক্ষ, নোভার্টিস কোম্পানির গবেষণালব্ধ বলে এই কোম্পানির ব্র্যান্ডনাম গ্লিভেক-এর (এদেশে Glivec আর আন্তর্জাতিক Gleevac) একমাসের খরচ এক লক্ষ টাকার মত। এ ব্যাপারে আবার পরে আসব।

ভবিষ্যৎ কী বলছে? :

আগেই বলেছি ইমাটিনিব মেসাইলেট অস্বাভাবিক টাইরোসিন কাইনেজ-কে নিষ্ক্রিয় করে কাজ করে। এটি এই গোত্রের প্রথম ওষুধ, এ হল ওষুধবিজ্ঞানীদের ভাষায় প্রথম প্রজন্মের 'টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটর'। দ্বিতীয় প্রজন্মের 'টাইরোসিন কাইনেজ ইনবিহিটর' নিলোটিনিব (Nilotinib) ও ডাসাটিনিব (Dasatinib)-কে ইমাটিনিব মেসাইলেট-এর চাইতে বেশি কার্যকর বলে ভাবা হচ্ছে। তৃতীয় প্রজন্মের 'টাইরোসিন কাইনেজ ইনহিবিটর' বসুটিনিব (Basutinib) এখনও গবেষণার স্তরে। বলে রাখি, বাঙালি বিজ্ঞানীর পদবি 'বসু' থেকে বসুটিনিব নাম। আশা করা যাচ্ছে ইমাটিনিব-এর যেসব অসুবিধা, পরবর্তী ওষুধগুলি তা থেকে অনেকটা মুক্ত হবে।

ইমাটিনিব মেসাইলেট ও আমার অভিজ্ঞতা:

ইমাটিনিব হল প্রথম ওষুধ যা আমার ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়া রোগীদের সত্যিকার ভরসা দিয়েছে, হ্যাঁ, 'রক্তের ক্যানসার' নিয়েও দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকা যায়। এটা বড় কম কথা নয়। আমি নোভার্টিস কোম্পানির 'গ্লিভেক' দিয়ে চিকিৎসা করেছি, 'ম্যাক্স ফাউন্ডেশান' নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে নোভার্টিস এই ওষুধ রোগীর সামর্থ্য অনুযায়ী কম দামে দেয়, সেভাবে দিয়েছি, বা রোগী বাজার থেকে ওষুধ কিনেছেন, ফলাফলে তফাৎ হয়নি। আবার ভারতে তৈরি যেসব ইমাটিনিব মেসাইলেট বিভিন্ন ব্র্যান্ডনামে বাজারে চলে, খরচ মাসে চারহাজার থেকে দশহাজার টাকার মধ্যে, সেগুলো দিয়ে চিকিৎসা করেছি, রোগী ভাল হয়ে গেছেন। অবশ্য আমার পক্ষে জোর দিয়ে বিভিন্ন

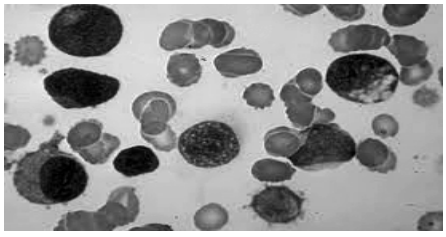

ব্র্যান্ড একেবারে সমান গুণমানের কিনা তা বলা সম্ভব নয়, বলতে গেলে যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা ও সমীক্ষা করতে হয় — সেটা আমার করা নেই।

আমি দেখছি ক্রনিক মাইলয়েড লিউকিমিয়ার রোগীরা মারা যাচ্ছেন 'স্বাভাবিকভাবে', অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাকে বা বার্ধক্যে বা অ্যাক্সিডেন্টে, লিউকিমিয়ায় নয়। আর এটা শুধু আমার অভিজ্ঞতা নয়, দুনিয়া জুড়ে যাঁরা লিউকিমিয়া রোগীদের চিকিৎসা করছেন, তাঁদের সবার অভিজ্ঞতা। চিকিৎসক হিসেবে এটা আমার কাছে একটা বড় পাওনা।

লেখক পরিচিতি : ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্য কলকাতার একটি সরকারি মেডিকেল কলেজে হিমাটোলজি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছরে পা দিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)

অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯

ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

আদালত ও একটি ওষুধ

ইমাটিনিব মেসাইলেট

সুপ্রিমকোর্ট সম্প্রতি ইমাটিনিব মেসাইলেট নিয়ে যে রায় দিয়েছেন তাতে যে কেবল লিউকিমিয়া রোগীরাই লাভবান হবেন এমন নয়। এই রায়ের ফলাফল অনেক সুদূরপ্রসারী— লিখছেন **ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত**

''In view of the findings that the patent product, the beta crystalline form of Imatinib Mesylate, fails in both the tests of invention and patentability as provided under clause (j), (ja) of section 2(1) and section 3(d) respectively, the appeal filed by Novartis AG fail and are dismissed with cost'' - Honourable Justice A. Alam and R. P. Desai, Supreme Court of India.

ভারতবর্ষের তিন লক্ষ লিউকিমিয়া (রক্তের ক্যান্সার) আক্রান্ত রোগী নিশ্চয় সুপ্রীম কোর্টের দুই মাননীয় ন্যায়াধীশ আফতাব আলম ও রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন। তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হবেন এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বহু উন্নয়নশীল দেশের লক্ষ লক্ষ রোগী যাঁরা 'ক্রনিক মায়ালোজেনাস লিউকিমিয়া' বা সি.এম.এল. বলে রক্ততন্ত্রের দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছেন। বিচারপতি আলম বা দেশাইকে তাঁদের অধিকাংশই নিশ্চয় চেনেন না, নামও শোনেননি। কিন্তু সাত বছর ধরে চলা একটি মামলায় বিচারপতি দ্বয়ের রায় ঐসব রোগীদের জীবনে নতুন আশার আলো সঞ্চার করেছে। এবং ঐ রায়ের সূত্র ধরে এইচ.আই.ডি / এইডস্, হেপাটাইটিস বি অথবা সি, অন্ত্র-বৃক্ক বা ফুসফুসের কর্কট রোগে আক্রান্ত বহু মানুষ আরও দীর্ঘদিন বাঁচাতে পারবেন। হয়ত বা পুরো আরোগ্যের আশাও করতে পারবেন। বহুজাতিক ওষুধ সংস্থার মুনাফার লালসা তাদের জীবনদ্বীপ চিরতরে নিভিয়ে দিতে পারবে না।

বড় নাটকীয় হচ্ছে যাচ্ছে না? পাঠকরা ভাবতেই পারেন, দুরারোগ্য ব্লাড ক্যান্সারের রোগীদের সঙ্গে আদালতের সম্পর্ক কি? কিভাবে তাঁদের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে একটি মামলার রায় -এর উপর। গৌরচন্দ্রিকা বন্ধ করে সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

ডা. মৈত্রেয়ী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ থেকে পাঠকরা জানতে পারবেন, যে 'ইমাটিনিব মেসাইলেট' নামের এক প্রায় 'অলৌকিক' ওষুধ কিভাবে ক্রনিক মায়ালোজেনাস লিউকিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের নতুন জীবন দিয়েছে। ১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ডে ওরেগন স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক ব্রায়ান ড্রুকার প্রমাণ করেন লিউকিমিয়ার কোষ ধ্বংস করে ফেলার ক্ষেত্রে এই ওষুধের আশ্চর্য ক্ষমতা। আবিষ্কৃত হল এক বিশল্যকরণী। এই আবিষ্কারের সঙ্গে ব্রায়ান ড্রুকার ছাড়াও জড়িয়ে আছে জীবরসায়নবিদ নিকোলাস লাইডন, কার্লো গাম্বাকর্টি প্যাসেরিনি, চার্লস সইয়ার প্রভৃতি চিকিৎসা বিজ্ঞানীর নাম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ওষুধের মেধাস্বত্ব বা পেটেন্ট দখল করে নোভার্টিস (পূর্বতন সিবা-গাইগী) কোম্পানী। কোম্পানি প্রদত্ত নাম বা 'ব্রান্ড নাম' হয় গ্লিভেক (Glivec অথবা Gleevec)। ১৯৯৬ সালে মূল ওষুধটি (Free Basic salt) পেটেন্টভুক্ত করা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ২০০১ সালে এফ-ডি-এ (Food and Drug Authority, USA)-র অনুমোদন পাবার সময় ওষুধের দাম ছিল বছরে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। ওষুধের চমকপ্রদ সাফল্যের সাথে সাথে নোভার্টিস দ্রুতগতিতে দাম বাড়াতে শুরু করল। ২০১১-১২ সালে দাম দাঁড়ালো বছরে প্রায় এক লক্ষ ডলার। কেবলমাত্র এই ওষুধ বেচেই কোম্পানীর বার্ষিক লাভ দাঁড়ায় প্রায় পাঁচশো কোটি ডলার বা পঁচিশ হাজার কোটি টাকা। গবেষণা এবং ওষুধ বাজারজাত করতে মোট খরচ হয়েছিল কমবেশী ২০ কোটি ডলার। বুঝে দেখুন মুনাফার বহরটা।

এতেই কোম্পানীর লালসার পরিতৃপ্তি হল না। ২০১৫ সালে পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তাই ১৯৯৮ সালে মূল ওষুধে সামান্য পরিবর্তন করে, এই ওষুধের Beta crystalline form-এর জন্য নতুন করে পেটেন্ট নেয় কোম্পানী—যাতে ২০১৫ সালের জায়গায় ২০১৮ সাল পর্যন্ত মেধাস্বত্ব টিকে থাকে। তিন বছর অতিরিক্ত পেটেন্ট মানেই প্রায় এক লক্ষ কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা, এক পয়সাও খরচ না করে।

খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকসমাজও বারে বারে তীব্র ভাষায় নোভার্টিসের এই তঞ্চকতার নিন্দা করেছেন। ক্যান্সার রোগীরা একদিকে অতি উচ্চ মূল্যের জন্য, কার্যকরী ওষুধ থাকা সত্ত্বেও, তার সুযোগ পাননি। অন্যদিকে ''শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়'' নোভার্টিসকে আরও ধনী করে তুলেছে। ক্যান্সার রোগীর প্রাণের বিনিময়ে এই মুনাফার প্রতিবাদে এই ওষুধের আবিষ্কার-কর্তা ব্রায়ান ড্রুকার, কার্লো গাম্বাকর্টি প্যাসেরিনি সহ ১০০ জন ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রখ্যাত জার্নাল 'The Blood' এ একটি চিঠি লিখে নোভার্টিসের অনৈতিক মূল্যের বিরোধিতা করেন এবং রোগীদের স্বার্থে দাম কমাতে অনুরোধ করেন। স্বয়ং ড্রুকার বলেন—''নোভার্টিস-এর আচরণে এবং পেটেন্ট আইনের অপব্যবহারে আমি হতাশ। বহু বিজ্ঞানী, সরকারি সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ওষুধের আবিষ্কারের জন্য শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও মুমূর্ষু রোগীদের প্রাণ বাঁচানোই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। এখন তাঁরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে চড়া দামের জন্য এবং ওষুধের সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে একচেটিয়া বাজার দখলের জন্য, সেই পরিশ্রমের ফসল রোগীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। ... ওরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গবেষণাতে যে অর্থ ব্যয় হয়েছিল, মূলত তা জনগণের অর্থ (Public Resource)। ২০০১ সালে এফ ডি এ এই ওষুধকে স্বীকৃতি দিলে আমার দশ

বছরের স্বপ্ন সফল হয়। কিন্তু এখন আমি চরম অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে নোভার্টিসের ধার্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। ওষুধ কোম্পানীগুলো নিশ্চয়ই তাদের লগ্নি করা অর্থের উপর লাভ আশা করতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পেটেন্ট আইনের অপব্যবহার করে এবং মূল অণুতে সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে তারা একচেটিয়া ব্যবসা করবে। এটা পেটেন্ট-এর ধারণা ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এই যদি আমাদের শ্রমের ফসল হয়, তবে বলতেই হবে যে এই ওষুধের আবিষ্কার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।"

Evergreening কি?

বিভিন্ন অধিজাতিক বা বহুজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাদের কিছু ওষুধ থাকে—যাকে তারা আদর করে বলে Block Buster Drugs, কোম্পানির মুনাফার সিংহভাগই আসে তিন চারটি ওষুধ থেকে। আবিষ্কারের কুড়ি বছর পরে এইসব ওষুধের পেটেন্ট বা মেধাস্বত্ব শেষ হয়ে যাওয়া কোম্পানির পক্ষে সমূহ ক্ষতি— কারণ পেটেন্ট মুক্ত এইসব ওষুধ তখন জেনেরিক নামে বা অন্য ব্রান্ড নামে বহু মাঝারি বা ছোট কোম্পানি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করবে। সেইজন্য বহুজাতিকরা প্রায়শই চেষ্টা করে মূল ওষুধে সামান্য পরিবর্তন করে, মূল অণু (Biomolecule)-র পার্শ্বশৃঙ্খলে (Side chain) একটি মিথাইল বা অ্যাসেটিল গ্রুপ ঢুকিয়ে অথবা অন্য কোনো রোগ সারাতে পারে এমন দাবি করে— পুরানো ওষুধটিকে একটি নতুন ওষুধ বলে চালানোর চেষ্টা করা এবং নতুন ভাবে পেটেন্ট নেওয়া, যাতে আরও বেশিদিন মেধাস্বত্ব বলবৎ থাকে। অর্থাৎ ''তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।"

নোভার্টিস এর কাছে ইমিটিনিব মেসিলেট এমনই এক কামধেনু। তাই ১৯৯৮ সালে 'গ্লিভেক' নামে এর বিটা কেলাসিত রূপ (Beta Crystalline Form) এরা পেটেন্ট করে। যুক্তি ছিল মূল লবণের চেয়ে মানবদেহের সংবহনতন্ত্রে গ্লিভেক-এর প্রবেশ ক্ষমতা ও দ্রবণীয়তা (bioavailability and solubility) বেশি। অথচ রোগ সারাতে এর কার্যকারিতা (efficacy) বেশি বা কর্মপদ্ধতি (mechanism of action) উন্নততর — এমন কোনো প্রমাণ নোভার্টিস দিতে পারেনি। মূল ওষুধ যেসব রোগীর ক্ষেত্রে প্রতিরোধী (Resistant) বলে দেখা গেছে, গ্লিভেকও সেখানে রোগ দমনে অক্ষম।

এই ধরনের তঞ্চকতারই পোষাকি নাম Evergreening আসলে বড় ওষুধের কোম্পানিগুলি গত পনেরো কুড়ি বছরে রক্তচাপ, মধুমেহ, সংক্রমণ, স্নায়ুতন্ত্র বা ক্যান্সারের নতুন কোনো ওষুধ আবিষ্কার করতে পারে নি। বেশিরভাগ 'ব্লকবাস্টার' ওষুধের পেটেন্টই শেষ হয়ে যাবে ২০১৪-১৫ সালের মধ্যে। তাই তারা মুনাফার বাজার অটুট রাখতে যেসব পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে তা হল—

(ক) ওষুধের পেটেন্ট সীমা বৃদ্ধির চেষ্টা করা (Evergreening)

(খ) পেটেন্ট-কেন্দ্রিক ওষুধ থেকে বিশ্বব্যাপী জেনেরিক ওষুধের ব্যবসায় প্রবেশ করা। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান মৃগয়াভূমি ভারতবর্ষ — কারণ চীনের পরেই ভারতবর্ষ জেনেরিক ওষুধের প্রধান উৎপাদক। ওষুধ শিল্পে ১০০% বিদেশি বিনিয়োগ ও ২০০৫ সালের নয়া পেটেন্ট আইন এক্ষেত্রে তাদের প্রধান সহায়।

(গ) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র বাইরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যচুক্তি (Bilateral Trade Agreement) মারফৎ পেটেন্ট এর সময়সীমা কুড়ি থেকে পঁচিশ বছরে নিয়ে যাওয়া।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে ভবিষ্যতে কখনও আলোচনা করা যাবে।

ভারতে নোভার্টিস এর কীর্তি

১৯৯৮ সালে ভারতের পেটেন্ট অফিসে নোভার্টিস গ্লিভেক-এর পেটেন্ট এর জন্য আবেদন করে এবং নানা কলাকৌশলের মারফৎ গ্লিভেক এর 'একচেটিয়া বিপণন স্বত্ব' (exclusive marketing right বা EMR) আদায় করে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জন্য অথবা যতদিন না পেটেন্ট আবেদনের ফয়সালা হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই ধরনের একচেটিয়া বিপণন সত্ব (মেধাসত্বের আবেদন গৃহীত হবার আগেই) এই দেশে কখনও কোনো কোম্পানীকে দেওয়া হয় নি।

ভারতবর্ষে CML রোগীর আনুমানিক সংখ্যা ৩ লক্ষ। প্রতি বছর ২৪ হাজার নতুন রোগী চিহ্নিত হন। গড়ে ১৮ হাজার রোগী মারা যান বছরে— মূলত ওষুধ কিনতে না পেরে। একচেটিয়া স্বত্ব যখন নোভার্টিস লাভ করে, তখন ইমিটিনিব-এর জেনেরিক ওষুধের ও অন্যান্য ব্রান্ড এর (Imanib, Imalek, Temsab, Zoleta ইত্যাদি) ১০০ মিগ্রা ক্যাপসুলের দাম ছিল গড়ে ৯০ টাকা। দিনে চারটি ক্যাপসুলের দাম পড়ত ৩৬০ টাকা। মাসে দশহাজার টাকার মত। এইসব ওষুধ উৎপাদন করত Cipla, Ranbaxy, Sun প্রভৃতি ভারতীয় কোম্পানী। নোভার্টিস একচেটিয়া উৎপাদন ও বিপনন স্বত্ব পেয়েই দাম করল ১০০০ টাকা ক্যাপসুল প্রতি। দৈনিক খরচ ৪০০০ টাকা। মাসে ১.২ লক্ষ টাকা। আগে ১০ হাজার টাকাতেই অধিকাংশ রোগী ওষুধ কিনতে পারতেন না। এখন তো প্রশ্নই ওঠে না। ফলে লালসায় যূপকাষ্ঠে বলি হতে লাগলেন ক্যান্সার রোগীরা। শুরু হল মৃত্যুর মিছিল।

২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে নোভার্টিস চেন্নাই হাইকোর্টে মামলা করে স্থগিতাদেশের (Injunction) বলে ভারতীয় কোম্পানীগুলির জেনেরিক ওষুধ তৈরি ও বিক্রি বন্ধ করে দিল। এইসব জেনেরিক ওষুধ শুধু ভারতবর্ষে নয়, এশিয়া - আফ্রিকার বহু উন্নয়নশীল দেশে রপ্তানী হত। ভারতে উৎপন্ন 'ইমাটিনিব'-এর উপরই বেঁচে ছিলেন এইসব দেশের CML রোগীরা। সেই রপ্তানীও বন্ধ হয়ে গেলে, অন্ধকার নেমে এল ঐসব দেশের রোগীদের জীবনে। ভারতীয় কোম্পানীগুলি আদালতকে তাদের আবেদনে জানালো যে নোভার্টিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় Pyramidine Derivatives (যা Imatinib এর উৎস) এর প্রস্তুতি প্রণালীর উপর পেটেন্ট পেয়েছে (Process Patient)। ভারতে Imatinib Mesylate এর মূল অণুর (Basic Molecule) উপর কোনো মেধাসত্ব বলবৎ নেই। তাহলে কেন এই একচেটিয়া বিপণনের অধিকার? মনে রাখতে হবে যে তখনও ২০০৫ সালের ভয়ঙ্কর পেটেন্ট আইন, যাতে উৎপাদন পদ্ধতির স্থানে উৎপাদিত বস্তুর উপর পেটেন্ট দেওয়া হয় (Product Patent), চালু হয় নি। কিন্তু আদালত তখন ভারতীয় কোম্পানিগুলির আবেদনে কর্ণপাত করেনি। বিশ্বের বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন নোভার্টিস এর কাছে আবেদন জানায় মুমূর্ষু রোগীদের মুখ চেয়ে এই একচেটিয়া বিপণনের অধিকার প্রয়োগ না

করতে। কা কস্য পরিবেদনা। নোবেলজয়ী সংগঠন Medicines Sans Frontiers এর কর্মাধ্যক্ষ লীনা মেঙ্গানি বলেন-- ''বহুজাতিক কোম্পানি যদি এইভাবে বর্গনামে জীবনদায়ী ওষুধের উৎপাদন আইনি পথে রুদ্ধ করে তাহলে তা ভয়ঙ্কর হবে। নোভার্টিস মামলা বিশ্বের, বিশেষত গরীব দেশগুলির অসুস্থ মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকারকে সঙ্কটের মুখে ফেলেছে। একই ঘটনা ঘটবে এইচ আই ভি / এইডস রোগীদের ক্ষেত্রে। ভারতীয় ওষুধের উপর নির্ভরশীল ৩০টি দেশের কয়েকলক্ষ রোগীর অধিকাংশই মারা পড়বেন।''

একটা কথা উল্লেখ না করে পারছি না। এই মামলায় নোভার্টিসের পক্ষের আইনজীবী কে ছিলেন জানেন? ভারতের বর্তমান অর্থমন্ত্রী পি সি চিদাম্বরম। হ্যাঁ, এনরন মামলাতেও তিনি প্রতারক মার্কিন কোম্পানির পক্ষে লড়াই করেছিলেন।

২০০৬ সালে নোভার্টিসের পেটেন্ট-এর আবেদন খারিজ হয়ে গেল— কারণ প্রমাণিত হল গ্লিভেক আদৌ কোনো নতুন ওষুধ নয়। পুরানো ওষুধেরই রকমফের। আর মূল ওষুধটির (Imatinib) উপর ভারতবর্ষে কোনো পেটেন্ট নেই।

ভারতের পেটেন্ট আইনের ৩(ঘ) ধারায় কোনো ওষুধের মেধাসত্বের অধিকার দিতে হলে দুটি গুণাগুণ প্রমাণ করতে হবে।

(ক) ওষুধটির অভিনবত্ব বা Novelty।

(খ) ঐ ধরনের পুরানো ওষুধের চেয়ে নতুন ওষুধের (যার পেটেন্ট চাওয়া হচ্ছে) অতিরিক্ত কার্যকারিতা বা Efficacy, যা জনস্বার্থে প্রয়োজন হতে পারে।

এই দুটি যুক্তির কোনোটিই গ্লিভেক-এর ক্ষেত্রে খাটে না বলে প্রমাণিত হল। অথচ এই সাত / আট বছরে একচেটিয়া উৎপাদন ও বিপণন সত্বের মারফৎ (EMR) নোভার্টিস ভারতবর্ষে ও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে কোটি কোটি ডলার অন্যায়ভাবে কামিয়ে নিয়েছে।

২০০৬ সালেই মেধাস্বত্বের অধিকারের জন্য নোভার্টিস মামলা দায়ের করল চেন্নাই হাইকোর্টে। তাদের মতে দেশের মেধাস্বত্ব আইনের ৩ (ঘ) ধারার কার্যকারিতা (Efficacy)-র ধারণা ধোয়াঁশাপূর্ণ। তারা দাবি করল Gipap বলে একটি কর্মসূচির মারফৎ Max Foundation বলে আমেরিকায় এক স্বেচ্ছাবেসী সংস্থার সহযোগিতায় তারা ভারতবর্ষের ১৬ হাজার CML রোগীর ৯৫% কে বিনামূল্যে গ্লিভেক দান করে। দাবি যদি সত্যও হয়, তাহলেও প্রশ্ন থাকে যে ৩ লক্ষ রোগীর মধ্যে বাকি ২.৮৪ লক্ষ তো জেনেরিক ওষুধের অভাবে মারা পড়বেন। আর ভারতীয় জেনেরিক ওষুধের উপর নির্ভরশীল তৃতীয় বিশ্বের CML রোগীরা কি করবেন? মানবদরদী এই ওষুধ কোম্পানী এ বিষয়ে নিশ্চুপ।

২০০৭ সালের ৬ আগস্ট, চেন্নাই এর উচ্চ ন্যায়ালয় নোভার্টিসের বিরুদ্ধে রায় দেন যে এই আবেদনের কোনো ভিত্তি নেই। নোভার্টিস Intellectual Property Appellate Boardএ যায়। সেখানেও তাদের আবেদন খারিজ হলে তারা ২০০৯ সালে মামলা করে সুপ্রীমকোর্টে।

২০১৩ সালের ১ এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ঐতিহাসিক রায়তে খারিজ হয়ে গেল এই কোম্পানীর প্রতারণাপূর্ণ আবেদন— যা প্রবন্ধের প্রথমেই লিখছি। সমস্ত যুক্তি প্রতিযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল খতিয়ে দেখে বিচারপতি আলম ও বিচারপতি দেশাই রায় দিলেন যে গ্লিভেক আদৌ কোনো নতুন ওষুধ নয় এবং পেটেন্ট-এর অধিকার দেবার অযোগ্য।

প্রশ্ন হল ১৯৯৮ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত আট বছরে এই কোম্পানী তঞ্চকতা করে যে বিপুল মুনাফা করেছে, তা কি দেশের জনগণকে ফেরৎ দেবে? এই পর্যায়ে যত রোগীর মৃত্যু হয়েছে মাসে ১ লক্ষ টাকার বেশি খরচ করে ওষুধ কিনতে না পেরে, তাদের প্রাণের দাম কিভাবে মেটাবে বর্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রাক্তন 'ক্লায়েন্ট' নোভার্টিস?

নোভার্টিস মামলা কেন ঐতিহাসিক?

সুপ্রীমকোর্টে এই দেওয়ানী মামলাটির নম্বর ২৭০৬-২৭১৬। বাদী---সুইজারল্যান্ডের অধিজাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা নোভার্টিস এ জি (Novartis AG)। প্রধান বিবাদী ভারত সরকার। মূল মামলার সঙ্গে যুক্ত আরও চারটি মামলা। যার একটিতে বাদীপক্ষ Cancer Patients Aid Association নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এছাড়া জেনেরিক ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থারাও ছিল তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে।

কিন্তু এই মামলার গতিপ্রকৃতির উপর নজর ছিল, শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীর নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সমাজকর্মীদের সংগঠন বা চিকিৎসক সংগঠন-এর। বহুজাতিক ওষুধ সংস্থাদের আকাশছোঁয়া লোভ সস্তার জেনেরিক ওষুধের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে কিনা, গরীব রোগীদের অন্ধকারময় মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে কিনা, মুনাফার অধিকার জীবনের অধিকারকে চিরতরে হরণ করতে পারে কিনা---তার অগ্নিপরীক্ষার মতোই ছিল এই নোভার্টিস মামলা। শুধু মায়ালয়েড লিউকিমিয়া নয়, আরও বহুরোগীর ভবিষ্যৎ জড়িয়ে ছিল এই মামলার সাথে। নীচের সারণি দেখুন।

কোম্পানী	ওষুধ	রোগ	টাকায় পেটেন্টেড ওষুধের দাম (মাসে)	টাকায় জেনেরিক ওষুধের দাম (মাসে)	কতদিন খেতে বা নিতে হয়
১। ফাইজার	Sunitinib (Sutent)	কিডনি ও অন্ত্রে ক্যান্সার	১.৯৬ লক্ষ	১৯,৬০০	রোগ অনুসারে
২। নোভার্টিস	Imatinib (Gleevec)	ব্লাড ক্যান্সার	১.২ লক্ষ	৮০০০	সারাজীবন
৩। বেয়ার	Sorafenib (Nexavar)	কিডনি ক্যান্সার	২.৮ লক্ষ	৮,৮৮০	রোগ অনুসারে
৪। অ্যাস্ট্রাজেনেকা	Gefitinib (Iressa)	ফুসফুসে ক্যান্সার	১.০৫ লক্ষ	৪২৫০	রোগ অনুসারে
৫। রোস	Erlotinib (Tarceva)	ঐ	৪৮০০ (প্রতিটির দাম)	১৬০০ (প্রতিটির দাম)	রোগ অনুসারে
৬। ব্রিস্টল মায়ার্স স্কুইব	Dasatinib (Sprycel)	ব্লাড ক্যান্সার	১.৪ লক্ষ	১৫৫০০	সারা জীবন
৭। রোস	Peginterferon alfa 2a	হেপাটাইটিস সি	৪.৩৬ লক্ষ	৪৭১৬০	রোগ অনুসারে

আশার কথা, এই সবকটির পেটেন্ট-এর আবেদনই খারিজ হয়েছে।

বহুজাতিক সংস্থা মার্ক শার্প এন্ড ডোহম (MSD) মামলা করে মধুমেহ রোগের ওষুধ 'জানুভিয়ার' এর বর্গনামে প্রতিকল্প উৎপাদন বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। ভারতীয় সংস্থা গ্লেনমার্ক একই ওষুধ উৎপাদন ও বিপণন করে ৩০ শতাংশ কম দামে। মার্কের দাবি ছিল ভারতীয় কোম্পানি তাদের মেধাস্বত্বের অধিকার লঙ্ঘন করেছে। দিল্লী হাইকোর্ট কিন্তু মার্কের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গ : গবেষণা

পেটেন্ট মামলায় হেরে নোভার্টিস সহ কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানি হুমকি দিয়েছে যে তারা ভারতবর্ষে গবেষণা (Research and Development) এর কাজ বন্ধ করে দেবে। অন্য কোনো দেশে গবেষণাগারগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবে। এ এক দারুণ রসিকতা, কারণ ভারতবর্ষে বর্তমানে নানা আইনি-বেআইনি Clinical trial ছাড়া (যেগুলি এইসব অধিজাতিকদের পিতৃভূমিতে করা অসম্ভব বা বিপুল ব্যয়সাধ্য) কোনো গবেষণাই হয় না। আদালতে পেশ করা নোভার্টিসের দেওয়া তথ্য থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এই পেটেন্ট মামলায় হারার অনেক আগেই, ২০১১-১২ সালে, এদেশে তাদের মোট ব্যবসা হয়েছিল ৯৩৩.২৭ কোটি টাকা ও মুনাফা ১৪৭.৬ কোটি টাকা। আর 'গবেষণার' ব্যয় ঐ বছর ছিল ২৯ লক্ষ টাকা। এবার দেশীয় গবেষণার কথা বললে বোধহয় ঘোড়াতেও হেসে ফেলবে।

ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা ও অন্যান্য ক্রান্তীয় রোগ (Tropical Diseases) এর ওষুধের উপর নোভার্টিসের গবেষণাগারগুলি অবস্থিত সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে— যেসব দেশে ঐ সব রোগ প্রায় হয়ই না।

প্রখ্যাত চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তিকা MIMS (Monthly Index of Medical Specialities, India)-এর সম্পাদক চন্দ্র গুলাটি বলেছেন যে—

''ওষুধ গবেষণা সংক্রান্ত সামান্যতম কাজের জন্যও সবকিছু অধিজাতিক সংস্থাদের নিজেদের দেশে পাঠানো হয়। তারপর আমেরিকা ইউরোপে পেটেন্ট নিয়ে, অনেক বেশি দামে আমদানী করে যেসব ওষুধ বিক্রি করা হয় ভারতে।"

তিনি আরও বলেছেন যে নোভার্টিসের মতো কোম্পানীগুলির বোলবোলাও হয়েছে আগে থেকে ব্যবহৃত নানা ওষুধে সামান্য পরিবর্তন করে নতুন পেটেন্ট নিয়ে—অর্থাৎ evergreening এর মারফৎ। সেখানে ভারতের পেটেন্ট আইনে নতুন ওষুধের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ও বেশি বেশি কার্যকারিতার কথা আছে বলে তারা ক্ষিপ্ত।

১৯৭০ সালের ভারতীয় পেটেন্ট আইনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জনমুখী ধারা ছিল Compulsory Licensing। এর মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের জোগান সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে পেটেন্টপ্রাপ্ত ওষুধের 'জেনেরিক' প্রতিকল্প তৈরির অনুমতি দিতে পারে, পেটেন্ট প্রাপকদের কোনো অনুমতি ছাড়াই। অবশ্য জেনেরিক উৎপাদকদের তাদের মোট বিক্রির ওপর ৪ থেকে ১০% রয়ালিটি দিতে হয় পেটেন্ট প্রাপককে। ২০০৫ সালের নয়া আইন মোতাবেক, এই আইন তুলে দেবার জন্যও বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানীগুলি প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে।

গ্লিভেক সংক্রান্ত মামলা তাই আর পাঁচটা দেওয়ানী মামলা এমনকি জনস্বার্থ মামলার থেকে পৃথক। এর তাৎপর্য বহুদূর প্রসারী। সাম্প্রতিক অতীতে এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে সুপ্রীম কোর্টের আর একটি ঐতিহাসিক রায়-এর। ১৮ই এপ্রিল সুপ্রীমকোর্টের আর একটি ডিভিশন বেঞ্চ (ন্যায়াধীশ আফতাব আলম, কে.এস. রাধাকৃষ্ণন ও রঞ্জন গগই) রায় দিয়েছেন যে উড়িষ্যার নিয়মগিরি পর্বতমালার বেদান্ত কোম্পানির বক্সাইট উত্তোলন বন্ধ থাকবে— যতক্ষণ না আদিবাসীদের নির্বাচিত গ্রামসভা (আদালতের পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে) সর্বসম্মতভাবে বলছে যে খনি সংক্রান্ত কার্যকলাপ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে না। আদিবাসীদের অ-সম্মতি সত্ত্বেও রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার এই অনুমোদন দিতে পারবে না।

দুটি মামলার মাননীয় ন্যায়াধীশদের আমার প্রণাম ও আদাব জানাই।

লেখক পরিচিতি : ডা. সিদ্ধার্থ গুপ্ত, এমবিবিএস, ডিসিপি, এম ডি, পেশায় প্যাথোলটিস্ট বায়োকেমিস্ট, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী।

ADVT

With Best Compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029
Phone : 033 2486-7885 / 8087
Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মিস্‌ক্যারেজের নানা মিথ্‌

মিস্‌ক্যারেজ বা Early Pregnancy Loss এক অত্যন্ত সাধারণ সমস্যা। প্রায় ২০ শতাংশ মেয়েদের এই দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একে প্রতিরোধ করার উপায় বড় কম। তা সত্ত্বেও প্রচলিত রয়েছে নানা ধরনের কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা, সামাজিক বিধিনিষেধ। শিক্ষিত মানুষজনও এর ব্যতিক্রম নন। এরকমই কিছু 'মিথ' বা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করছেন **ডা. কাঞ্চন মুখার্জি**

আমাদের আজকের আলোচনা মিসক্যারেজ নিয়ে। অবশ্য সব ধরনের মিসক্যারেজ নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব না, গর্ভাবস্থার প্রথম তিনমাসে ঘটা মিসক্যারেজ, যার পেছনে কোনও জ্ঞাত ডাক্তারি কারণ নেই, সেগুলি নিয়ে যেসব ভুল ধারণা আছে, তার মধ্যেই আমাদের নিবন্ধ সীমাবদ্ধ রাখব। মিসক্যারেজ কথাটির একটি বাংলা প্রতিশব্দ আছে— 'গর্ভপাত'। তবে ইচ্ছে করে কৃত্রিম উপায়ে ঘটানো গর্ভ নষ্ট করা, আর প্রাকৃতিক কারণে ঘটা গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু— 'গর্ভপাত' কথাটি দ্বারা এ-দুয়ের তফাৎ করা হয় না। আমরা এখানে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক কারণে ঘটা ভ্রূণ-মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করব; তাই নিবন্ধের শিরোনামে ইংরাজি 'মিসক্যারেজ' কথাটাই রেখেছি।

✠ মায়ের দোষেই মিসক্যারেজ।

সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অফিসের কাজ, সংসারের কাজ বা সাময়িক চাপ-এর ফলে মিসক্যারেজ হয়েছে বলে হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু এর কোন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ নেই। অনেক সময় মায়েরা নিজেরই নিজেদের দোষারোপ করেন। হয়তো বা এটাই আমাদের সামাজিক রীতি, যে রীতিটি মায়েরা আত্মস্থ করেন, আর সন্তান-সন্ততির যে কোনও দুর্দশার দায় নিজেদের ওপর চাপিয়ে নেন।

✠ এ তো খুব বিরল।

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যেই প্রায় ২০ শতাংশ বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। অবিশ্বাস্য হলেও পরিসংখ্যান তাই বলে। তবে যাঁদের একবার, দুবার, এমনকি তিনবার মিস্‌ক্যারেজ হয় তাঁদেরও অধিকাংশেরই পরবর্তীকালে সুস্থ সন্তান হয়।

✠ কম্পিউটার স্ক্রিনের অধিক ব্যবহারে মিসক্যারেজ বাড়ছে।

অফিস কাছারিতে যে সব মায়েরা সারাদিন কম্পিউটার নিয়ে কাজ করেন তাঁদের ধারণা হতে পারে যে এর ফলে তাঁদের মিস্‌ক্যারেজের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ নিয়ে বেশ কিছু নিরীক্ষা হয়েছে এবং এটা ভুল ধারণা বলে প্রমাণিত।

✠ গর্ভপাত করানো পরবর্তীকালে মিসক্যারেজের কারণ।

যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত সময়ে নিরাপদ পদ্ধতিতে ডাক্তারি গর্ভপাত (Medical Termination of Pregnancy) ভবিষ্যতের মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়ায় না।

✠ জন্মনিরোধক বড়ি মিস্‌ক্যারেজের কারণ।

একেবারে ভুল ধারণা। রোজ একটা করে গর্ভনিরোধক হিসেবে চার সপ্তাহে ২১ দিন বা ঐরকম যেসব বড়ি রোজ একটা করে খাওয়া হয় সেগুলো মিসক্যারেজ-এর সম্ভাবনা বাড়ায় না। তবে গর্ভাবস্থার প্রথমে (সাধারণত অবাঞ্ছিত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে, মায়েরা ইচ্ছে করে করেন) একসাথে একগাদা গর্ভনিরোধক বড়ি খেলে 'মিসক্যারেজ' হতে পারে।

✠ গরম জলে স্নান করলে মিসক্যারেজ হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় শরীরের তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়ুক এটা অভিপ্রেত নয়। কিন্তু প্রচন্ড বেশি জ্বরের কারণে মিসক্যারেজ হয়েছে এমন শোনা গেলেও গরম জলে স্নান করার ফলে কারো বাচ্চা নষ্ট হয়েছে বলে শোনা যায়নি।

✠ গর্ভাবস্থায় যৌনসঙ্গম করলে মিসক্যারেজ হতে পারে।

এর পেছনে কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। গর্ভাবস্থার প্রথম দশা থেকে শেষ দশা পর্যন্ত যৌনসঙ্গম সাধারণভাবে মিসক্যারেজ-এর সম্ভাবনা বাড়ায় না।

✠ প্রোজেস্টেরন হরমোন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে মিসক্যারেজ আটকানো যায়।

এটা বিতর্কিত বিষয়। কয়েকটা ছোট ছোট গবেষণার ফল থেকে এরকম ঈঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে গর্ভাবস্থায় প্রজেস্টেরন হরমোনের কয়েকটি ধরন হয়তো কোনও ওষুধ না দেবার চাইতে, বা 'প্লাসিবো' দেবার চাইতে, গর্ভপাত ঠেকাতে কিছু ফল দিলেও দিতে পারে। কিন্তু গর্ভাবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রী-অঙ্গ থেকে রক্তপাত হলেই তাঁকে প্রোজেস্টেরন দিয়ে গর্ভপাত আটকানোর চেষ্টা করা বিজ্ঞানসম্মত— এমন কথা বলার আগে অনেক বড় আকারে, বেশি রোগীর মধ্যে, এবং বিভিন্ন ধরনের অবস্থায় প্রোজেস্টেরন প্রয়োগে উপকার হল কিনা সেই পরীক্ষা করতে হবে। (প্লাসিবো হল ওষুধের মত কাজ করে না এমন জিনিস যা রোগীকে ওষুধ বলে দেওয়া হয়। বাংলায় 'রোগীতোষ' বলা যেতে পারে)।

✠ স্থূলত্ব মিসক্যারেজ হবার ঝুঁকি বাড়ায়।

এর মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও থাকতে পারে। স্থূলকায়া মহিলাদের মধ্যে মিসক্যারেজের হার বেশি। কিন্তু এর পেছনের কারণটা আমরা জানি না। আর কি কতটা পর্যন্ত ওজন থাকলে তা 'নিরাপদ', আর

কতটা 'মোটা' হলে মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়তে শুরু করবে— সেটাও জানি না। এবিষয়ে চটজলদি নিদান দেবার আগে আরও গবেষণা দরকার।

✠ এইচ সি জি (HCG) ইঞ্জেকশন দিয়ে মিসক্যারেজ আটকানো যায়।

এটাও ওই প্রোজেস্টেরন হরমোন সাপ্লিমেন্ট দিয়ে মিসক্যারেজ ঠেকানোর মতো বিতর্কিত বিষয়। এমন ব্যয়বহুল একটি চিকিৎসা রোগীর ওপর চাপিয়ে দেবার আগে সেটা ঠিকভাবে প্রমাণ হওয়া উচিত। আর সেই প্রমাণটা করবার জন্য এখনও উপযুক্ত উচ্চমানের গবেষণা করা বাকি আছে।

✠ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিয়ে মিসক্যারেজ-এর সম্ভাবনা কমে।

মিসক্যারেজের সম্ভাবনা দেখলেই অধিকাংশ চিকিৎসক যে কথাগুলো বলেন তার মধ্যে বিশ্রাম আর শুয়ে থাকার ব্যাপারটা প্রায় সব সময়েই থাকে। কিন্তু বিশ্রাম আর শুয়ে থাকা---এর ফলে মিসক্যারেজ আটকানো গেছে এমন কোনও তথ্য-প্রমাণ নেই। তবে হ্যাঁ, গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে যোনিমুখে রক্তস্রাব হলে অনেক মহিলারই শুয়ে থাকতে ভাল লাগতে পারে। সে কথা আলাদা। কর্মরতা মহিলাদের কাজ কামাই করে লাভ হবে এমনটাও নয়—অবশ্য অন্য কোনও মেডিক্যাল কারণে যদি তাঁর বিশ্রাম দরকার পড়ে সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

অন্যদিকে, অতিরিক্ত বিশ্রাম ডিপ ভেন থ্রম্বোসিস (পায়ের গভীর শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধা)-এর সম্ভাবনা বাড়ায়, আর হবু মা'কে আরও অসুস্থ করে তোলে।

মিসক্যারেজ কেন হয়?

এখন প্রশ্ন আসতে পারে মিসক্যারেজ-এর পিছনের কারণটা ঠিক কি? কিভাবে এটা কাজ করে? এখন বিজ্ঞানীরা মোটের ওপর একমত যে ক্রোমোজোম-ঘটিত ত্রুটির জন্য অধিকাংশ প্রথম পর্যায়ের মিসক্যারেজ ঘটে। এই ক্রোমোসোম-ঘটিত ত্রুটিটি একটা আচমকা-ঘটা দুর্ঘটনা মাত্র, এবং পরবর্তী প্রেগন্যান্সিতে তার কোনও ছাপ পড়ে না।

মায়ের বেশি বয়স হয়ে গেলে, বিশেষ করে ৩৫ বছরের ওপরে মায়েরা গর্ভধারণ করলে, এই কারণে মিসক্যারেজ-এর সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে এছাড়াও আরও কিছু কারণ আছে—

ধূমপান : মা যদি দিনে ১৪টি বা তার বেশি সিগারেট (বা সমতুল্য বিড়ি ইত্যাদি) খান, তবে তাঁর মিসক্যারেজের সম্ভাবনা অ-ধূমপায়ীর চাইতে দ্বিগুণ।

মদ : সপ্তাহে চার 'মাপ' পরিমাণ বা তার বেশি মদ্যপান করলে মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়ে। এক 'মাপ' মদ হল মোটামুটি আধ পাঁইট বিয়ার বা একটা ছোট গ্লাসভর্তি ওয়াইন ইত্যাদির সমতুল।

তথাকথিত 'রিক্রিয়েশনাল ড্রাগ' : এর কয়েকটিতে মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।

জরায়ুর গঠন বিকৃতি : জন্মগত জরায়ু অপগঠন যেমন বাইকরনুয়েট জরায়ু মিসক্যারেজ ঘটাতে পারে; আবার জরায়ুর মধ্যে বড়সড় টিউমার থাকলে তার কারণেও মিসক্যারেজ হতে পারে।

মেডিক্যাল রোগ : অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, সিস্টেমিক লুপাস এরিথেমেটোসাস বা অ্যান্টি-ফসফোলিপিড সিনড্রোম--- এসবেও মিসক্যারেজ হতে পারে।

অপ-পুষ্টি : অতিরিক্ত স্থূলতা যেমন

মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়ায়, খুব কম ওজন (রোগা) হলেও এই সম্ভাবনা বাড়ে।

কি করে মিসক্যারেজ ঠেকাবেন?

যেহেতু মিসক্যারেজের মূল কারণ কোষের ভেতরে ক্রোমোজোমের ত্রুটি, তাই একে আটকানো খুব মুশকিল। গর্ভধারণ করার আগে ও গর্ভাবস্থায় মা যতটা সুস্থ থাকতে পারবেন, মিসক্যারেজের সম্ভাবনা তত কমবে।

গর্ভধারণের আগে মা যদি সুস্থ থাকেন, ভ্রূণটিও সুস্থ বাঁচার পরিবেশ পাবে। নিয়মিত যথাযথ ব্যায়াম, সুস্থ খাদ্যাভ্যাস, শরীরের ওজন ঠিক সীমার মধ্যে রাখা (বি এম আই ২০ থেকে ২৫ এর মধ্যে রাখলে না-রোগা না-মোটা বলতে পারি) এবং অবশ্যই ধূমপান নিষেধ। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েডের রোগ ইত্যাদি থাকলে সেগুলি সুনিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। আবার ওষুধগুলো এমন করে বাছতে হবে যেন তারা গর্ভস্থ ভ্রূণের পক্ষেও নিরাপদ হয়।

গর্ভসঞ্চার ঘটে যাবার পর অর্থাৎ প্রেগন্যান্ট অবস্থায়ও ওই একই ব্যবস্থা: সুস্থ থাকা, নেশামুক্ত থাকা, সঠিক ওজন বজায় রাখা ও কোনও রোগ থাকলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা।

- আপনার যদি মিসক্যারেজ হয়ে থাকে, জেনে রাখুন সেটা আপনার কোনো কৃতকর্মের ফলে হয়েছে এমনটা মোটেই নয়।
- মিসক্যারেজ আটকানোর জন্য আপনি (নিজেকে সাধারণভাবে নীরোগ ও নেশামুক্ত রাখা ছাড়া) কিছুই করতে পারতেন না বা পারবেন না।
- ক্রোমোসোমের ত্রুটির ফলে সন্তান মারাত্মক ব্যাধি বা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারত, মিসক্যারেজ হবার ফলে প্রকৃতি স্বয়ং সে সম্ভাবনা রোধ করল।
- একবার মিসক্যারেজ হবার পরে যদি আপনি গর্ভবতী হন, তার জন্য আপনাকে আলাদা যত্ন বা অতিরিক্ত বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন নেই।
- সাধারণ খেলাধূলায় মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়ে না। তবে Bungee Jumping বা তেতলার ছাদ থেকে একতলায় ঝাঁপ মারা– এসব ভয়ানক ঝাঁকুনিতে মিসক্যারেজ হতে পারে।
- সাধারণ খাবার খেলে মিসক্যারেজ হয় না। বিশেষ করে আনারস বা পেঁপে বা বেদানা খেলে মিসক্যারেজের সম্ভাবনা বাড়ে — এ ধারণা ভুল। কেউ যদি কেবল এইসব ফল খান, আর কিছুই না খান— সেকথা স্বতন্ত্র। কেউই সেরকম করেন না।

চিকিৎসা

চিকিৎসার উদ্দেশ্য দুটো: (১) শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তপাত আটকানো; (২) যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফ করে দেখা যায় ভ্রূণের দেহে প্রাণ নেই তো সেটিকে দ্রুত মায়ের দেহের বাইরে বের করে ফেলা।

আমাদের দেশে মৃত ভ্রূণ বের করে দেবার জন্য সার্জিকাল ইভ্যাকুয়েশন বেশি চালু — চলতি

কথায় আমরা বলি 'ওয়াশ' করে দেওয়া। তবে খুব বেশি রকমের রক্তপাত নেই অথচ ভ্রূণটি মারা গেছে, এমন অবস্থায় দ্বিতীয় এক পথ আছে। আজকাল নতুন কিছু ভালো ওষুধ বেরিয়েছে, সেগুলো নিরাপদ ও কার্যকরভাবে ভ্রূণটিকে মায়ের দেহের বাইরে বের করে দেয়; 'ওয়াশ' করার দরকার হয় না। সুতরাং অজ্ঞান করার বা হাসপাতালে ভর্তি করার ঝুঁকি ও ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

মায়ের মানসিক সুস্থতা ও দৃঢ়তা পাবার ব্যাপারটা কিন্তু ভুললে চলবে না।

মা-বাবাকে মানসিক সার্পোট দেওয়া এসময় খুব জরুরি। তাঁরা যেন এর জন্য নিজেদের অপরাধী না ভাবেন। আর এর সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা ও ভাবতে হবে। পরের প্রেগন্যান্সির জন্য কদিন অপেক্ষা করবেন তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। খালি দেখতে হবে, মিসক্যারেজের পর মা সুস্থ হয়েছেন তো? যদি সুস্থ হয়ে থাকেন, তো পরের প্রেগন্যান্সি সবসময়েই স্বাগত— বিশেষ করে যদি দম্পতি নিঃসন্তান হন।

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখার্জি, এমবিবিএস, এমআরসিওজি, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

এবিপি আনন্দের অ্যাঙ্কর টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় চলে গিয়েছেন ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর, মাত্র ৩৪ বছর বয়সে।

সন্দীপ্তা অন্যের জন্য ভাবতে এবং করতে জানতেন।

তাঁকে মনে রেখে স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর এই উদ্যোগ।

advt.

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস
সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র
পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে
গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন)
আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন
যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭
দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :
দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।
যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com
ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

বাজারী খাদ্য এবং স্বাস্থ্যনাশকতা

আমাদের ঘরোয়া চিরপরিচিত খাদ্যগুলো নাকি ভারি সেকেলে, আর তেমন পুষ্টিকরও নয়। আমাদের অর্ধেক ফসল নাকি মাঠে বা গোলাতে ইঁদুর আর পোকায় খেয়ে ফেলে। এর সমাধানও বিজ্ঞানের আশীর্বাদে একেবারে দোরগোড়ায়— খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারে সহজপ্রাপ্য সুস্বাদু চটজলদি খাদ্য। খবরের কাগজ, টিভি এবং নানাবিধ মিডিয়ায় প্রচারে এই সব কথার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলাটা মূর্খতা— মিডিয়ার কর্পোরেট মুখ আপনাকে সেকথা দ্রুত বুঝিয়ে ছাড়বে। কিন্তু এ গল্পের মধ্যে আসল সত্যিটা কোথায় হারিয়ে গেছে — দেখাচ্ছেন **ড. তুষার চক্রবর্তী।**

বিলেতের বিখ্যাত ওয়েলকাম ট্রাস্টের প্রকাশিত একটি পকেটবই রয়েছে হাতের কাছেই। সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রিটেনে বছরে গড়পড়তা ৮৩ লাখ টন খাবার আবর্জনায় ফেলে দেওয়া হয়। খুব কম করে ধরলেও একেকটি পরিবারের বছরে ফেলে দেওয়া এমন খাবারের দাম ৬৮০ পাউন্ড। সপ্তাহান্তে যে সব ব্যাগভর্তি খাদ্যপণ্য সুপার-মার্কেট থেকে বিলেতের বাবুবিবিরা কেনেন, তার তিনটি ব্যাগের একটি নিছক ফেলে দেওয়ার জন্যে কেনা হয়। বিলেতের সাহেবরা মার্কিনিদের চেয়ে অনেক বেশি হিসেবি। তাদের অবস্থা যেখানে এই— সেখানে আমেরিকা ও তার অনুকরণকারী দুনিয়ার হিসেবটা ভেবে দেখুন। আপনি নিশ্চয় জানতে চাইছেন, এই অপচয় হয় কেন?

আসলে, এই বাড়তি খাবার কেনায় বিজ্ঞাপন। ক্রেতারা হয় কেনেন লোভে, নয় বিজ্ঞাপনের মোহে। যেন কিনতে হয়—নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমরা সত্যি সত্যি একটি খাদ্যসংকটের মধ্যে রয়েছি— এবং তা বাড়ছে। কিন্তু, তার অন্যতম কারণ খাদ্য-উৎপাদন নয়— বরং মূল কারণ খাদ্যব্যবসার তথাকথিত প্রগতিশীল আধুনিকীকরণ। এককথায় যা কর্পোরেট খাদ্যসংস্কৃতি। যে নমস্য খাদ্যসংস্কৃতি আমাদের মধ্যে আলুর খোসা, লাউয়ের বাকল, কাঁঠালের বিচিটাও না ফেলে, খাদ্যে পরিণত করবার শিক্ষা রোপন করেছিল, তা থেকে আমরা যত সরে আসব রিলায়েন্স, স্পেন্সার, মোর, ওয়ালমার্ট, টেসকোর খাদ্যবাজারের দিকে, তত আরো ভয়াবহ খাদ্যসংকট আমাদের দেশকে অজগর সাপের মত পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে। রোজকার বাজার আর ওয়ালমার্টের শপিং-এর তফাৎ যোজন-যোজন। কর্পোরেট বাজারের হাত ধরে সুস্থায়ী— অর্থাৎ টেঁকসই এবং ট্যাঁক-সই খাদ্য-পুষ্টি-উন্নয়নে পৌঁছানো প্রায় কাঁঠালের আমসত্ত্ব রচনার সামিল। অথচ প্রচার ও উন্নয়নের সম্মোহনে একবার সাড়া দিলে এই বৈপরীত্যটা আর চোখেই পড়েনা! আমরা পতঙ্গের মত ঝাঁপাই উন্নয়নের আগুনের দিকে।

শুধু বিজ্ঞাপনের তাড়নায় অপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনবোধে কিনিয়ে নেওয়াটাই কর্পোরেট খাদ্যবাণিজ্যের শেষ কথা নয়। এর আরেকটি মারাত্মক দিক— এরা যা আমাদের গেলায় আমাদের

দেহে তার ফলাফল। অর্থাৎ, না ফেলে দিয়ে যেটুকু খাচ্ছি সেটাও কি নিরাপদ? চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য গবেষকরা ঠিক এই প্রশ্নটাই তুলেছেন। এঁরা দেখাচ্ছেন, যে সব কর্পোরেট প্যাকেজজাত বহুবিজ্ঞাপিত খাদ্য ও পানীয় আমরা সাগ্রহে খাই বা পান করি, সেসব হয়ে উঠছে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে ঘোরতর বিপদের কারণ। বিশ্বের রোগের মানচিত্রটাই এরা বদলে দিচ্ছে। যে সব অসংক্রামক রোগ মহামারীর আকার ধারণ করছে— খোঁজ নিলে দেখব ---কর্পোরেট-বিজ্ঞাপিত ফ্যাশানেবল খাবারদাবার হল তাদের প্রধান বাহক। মশা যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুর বাহক, কর্পোরেট প্যাকেজজাত খাদ্য হল ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, মেদরোগ, ক্যানসার সহ একগুচ্ছ রোগের কারণ— যারা হু হু করে বাড়তে বাড়তে চিকিৎসাব্যবস্থাকেই আজ ধ্বসিয়ে দিচ্ছে। আহাম্মক আমরা একদিকে যেমন মশা না মেরে খুঁজছি ম্যালেরিয়ার ওষুধ, অন্যদিকে খাদ্যসচেতন না হয়ে চাইছি আরো আরো উচ্চমানের হাসপাতাল এবং সুচিকিৎসা।

খাদ্যবাণিজ্য, খাদ্যব্যবস্থা এবং জনস্বাস্থ্যের এই বিপদজনক দ্বিতীয় প্রবণতা নিয়েই এখানে আলোচনা করব।

বিশ্বায়ন

আজকের বিশ্বায়নের যুগে একদিকে যখন খাদ্য বা খাদ্যের অধিকারের (রাইট টু ফুড) দাবী রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে এবং দেশে দেশে নাগরিক-সমাজ এ নিয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছেন তখন অন্যদিকে ঘনিয়ে উঠছে আরেকটি বিপজ্জনক প্রবনতা। কর্পোরেট-মহল গোটা বিশ্বের খাদ্যব্যবস্থাকে নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসছে। এদের হাতে কৃষি এবং খাদ্য হয়ে উঠছে অত্যন্ত মুনাফাজনক একচেটিয়া ব্যবসা। মুনাফাবৃদ্ধি, শোষণ ও কৃষকসহ খাদ্যব্যবসার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত বহু মানুষের কর্মচ্যুতির পাশাপাশি তা জনস্বাস্থ্যের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে দিতে শুরু করেছে— তা সম্ভবত আরো বেশি বিপজ্জনক। কেননা তার প্রভাব পড়ছে সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের ওপর। উদ্বৃত্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও দুনিয়ার কম করে ১০০ কোটি মানুষ যেমন ক্ষুধা এবং অপুষ্টির শিকার, তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ কম করে ২০০ কোটি মানুষ স্থূলত্ব তথা মেদরোগে (ওবেসিটি) আক্রান্ত। আমাদের দেশেও দুটোই যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে! একদলের বিপদ না খেয়ে তো অন্যদলের বিপদ বেশি খেয়ে। ১৯৯৫ সালের পর বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতি যত সমৃদ্ধ হতে শুরু করল--- তত বেশি ভারতবাসী ক্ষুৎপীড়িতের দলে নাম লিখিয়েছেন, সাড়ে ছয় কোটি নতুন মানুষ। আবার প্রতি পাঁচজন দেশবাসীর মধ্যে একজন এখন মেদরোগের শিকার! এই আপাত বিসদৃশ ও প্রহেলিকাময় ঘটনার মূলেই

রয়েছে পুষ্টিবিকৃতি। এই দুই আপাত-বিপরীত বিকৃতির উৎস আসলে একটাই। সেটা হল মুনাফামুখী খাদ্যব্যবস্থা। একচেটিয়া কর্পোরেট দখলদারী এই সমস্যাটিকে বাড়িয়ে তুলছে।

অথচ একটু নজর করলেই দেখবেন যে এই সব ঘটনার দোষ চাপানো হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের ওপর। অপুষ্টি ও ক্ষুধার জন্য দায়ী করা হয় খরা, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণকে। মেদবৃদ্ধির জন্য দায়ী করা হচ্ছে মানুষের আয়-বৃদ্ধি বা সমৃদ্ধিকে। এবং এই সবকটি সমস্যা, এমনকি খাবারে কীটনাশকের উপস্থিতি ও খাদ্য-অপচয় কমাবার উপায় হিসেবেও উন্নত প্রযুক্তি, পরিষেবা ও উৎপাদন বৃদ্ধির নামে মনসান্তো থেকে ওয়ালমার্টকে আবাহন করছে আমাদের সরকার, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র, প্রযুক্তিবিদ এবং অধিকাংশ গণমাধ্যম। এদের সঙ্গে বিশ্বায়নের কান্ডারি কর্পোরেট-ব্যবসায়ীদের যে সব যোগসূত্র— তা খোঁজার জন্য খুব বেশি কষ্ট করার দরকার নেই। তার অজস্র প্রমাণ আপনারা হাতের কাছেই পাবেন। কৃষি ও খাদ্যকে আমরা যত মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় না ভেবে ব্যবসা হিসেবে ভাবব, তাদের আরো বেশি বেশি মুনাফামুখী করে তুলবো, তত এই পুষ্টিবিকৃতি বাড়বে। মনে রাখতে হবে, মেদরোগের সঙ্গে যুক্ত হল ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চরক্তচাপ-জনিত ব্যাধি, চক্ষুরোগ, এবং কিডনি সহ নানা রকমের শারীরিক রোগ। জনসমাজে এদের উপদ্রব সেই কারণেই দিনে দিনে বাড়ছে। চিকিৎসা-পরিষেবার ওপর সেই চাপ এসে পড়ছে। রোগীদের চাহিদার তুলনায় পরিষেবা কম বলে ক্রমশ চিকিৎসা হয়ে উঠছে দুর্মূল্য। এইভাবে এক পাপচক্রে জড়িয়ে পড়ছে আমাদের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-পরিষেবা।

গরিবরা এতদিন মরত না খেয়ে— উন্নয়নের নামে এবার ভুল-খেয়ে মরার পথে সবাইকে ঠেলছে আজকের বিশ্বজোড়া খাদ্যের বড় বাজার। কেননা, খাবারের ব্যবসা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসা। বিশ্বায়নের যুগে এই গোটা খাদ্য বাজার দখল করে নিচ্ছে গুটি কতক কোম্পানি। সস্তা থেকে দামী— সব রকম খাবার নিয়েই এদের কারবার। আর এদের সবচাইতে বিজ্ঞাপিত খাবার, যা আমজনতা প্রতিদিন গোগ্রাসে খাচ্ছে, সেগুলিই হল যাবতীয় অসংক্রামক রোগের অন্যতম উৎস।

বিপরীতের ঐক্য

রাষ্ট্রসংঘের দেওয়া হিসেবে বলে যে বিশ্বে ১০০ কোটি মানুষ যখন না খেতে পেয়ে ক্ষিধের যন্ত্রণা সহ্য করছেন প্রতিদিন, তখন ২০০ কোটি খানেবালা মানুষ ভুগছেন মেদরোগসহ আনুষঙ্গিক রোগে। এই হিসেবটা চোখের সামনে তুলে ধরলে আমরা সোজাসুজি ধরে নিই যে প্রথম বর্গে রয়েছেন গরীব আর দ্বিতীয় বর্গে রয়েছেন ধনীরা। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই বিভাজনটা হয়ত করা যেত। কিন্তু ঐ শতকের শেষের দিকে ছবিটা পাল্টে যায়। গরীবেরা এখন দু-পক্ষেই সংখ্যাগুরু। তাঁরা একদিকে যেমন আধপেটা খেয়ে রয়েছেন— অন্যদিকে যেটুকু খাবার পাচ্ছেন, যা খাচ্ছেন, তা খাদ্যগুণের বিচারে, পুষ্টির বিচারে অত্যন্ত নিকৃষ্ট। প্রক্রিয়াজাত খাবার এখন সস্তা ও

সহজলভ্য। সবচাইতে সস্তার শর্করা, লবণ, চর্বি ও অ্যাসিড ব্যবহার করে সস্তা ও মুখরোচক যে সব খাবার তাঁদের যোগানো হয়, বহুবিজ্ঞাপিত সেই সব খাবার পুষ্টিবিকৃতির সহায়ক। পচন ঠেকাবার জন্য যেসব রাসায়নিক এতে যুক্ত করা হয় তাদের মধ্যে রয়েছে আরেক গুচ্ছ মারক রোগের বীজ। যে সব প্লাস্টিকের প্যাকেটে এদের ভরা হয় তারাও বিষাক্ত। এই সব বিষ শুধু যে ক্যান্সার ঘটায় তাই নয়— এদের মধ্যে আছে শরীরের হরমোন বিপর্যস্ত করার মত এবং সরাসরি মেদরোগ ঘটাবার মতন অনেক রাসায়নিক। এই ধরনের সস্তার মুখরোচক খাবার খেয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গরীবরাও আজ দ্রুত পুষ্টিবিকৃতি-জনিত রোগ হিসেবে ডায়াবেটিস, মেদরোগ, হৃদরোগ, উচ্চ-রক্তচাপ, মানসিক রোগ ও ক্যান্সার ইত্যাদির শিকার হচ্ছেন।

আর এটা সম্ভব করে তুলছে বিশ্বায়ন এবং খাদ্যবাণিজ্যে একচেটিয়া দেশি-বিদেশি কর্পোরেট গোষ্ঠীর অবাধ বিস্তার। কেউ কেউ বলছেন যে এটা করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল ক্ষুধা ও পুষ্টিবিকৃতি এই দুইয়ের কাঁচির মত ফলায় বিশ্বের গরীবমানুষদের ছাঁটাই করা। তাঁদের মতে এ হল এক বৈজ্ঞানিক ও সুপরিকল্পিত জনসংহারনীতি। পরিকল্পিত হোক বা অপরিকল্পিত, মুনাফা বৃদ্ধি ও বাজার বাড়াবার লক্ষ্যে ধাবিত কর্পোরেট খাদ্যবাণিজ্য যে কার্যত জনস্বাস্থ্যের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছে— সেটা কিন্তু অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। গরীবমানুষদের বাঁচাবার জন্য তাই ক্ষুধা ও পুষ্টিবিকৃতি এই দুয়ের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে। খাদ্যবাণিজ্যের বিশ্বায়ন এবং একচেটিয়া কারবারকে ঠেকাতে না পারলে সুষম খাদ্য গরীবের কাছে পৌঁছে দেবার অন্য কোনো উপায় নেই। অথচ উন্নয়নের নামে আমাদের একবারে উল্টোপথের দিকেই আজ ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

বিপরীতের ঐক্যের চেহারা ভারতে কতটা বিকট হয়ে উঠেছে সেটা পরিসংখ্যানে একেবারে পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। ১৯৯৫ সালের হিসেবে দেখা যায় যে ভারতে ক্ষুৎপীড়িত মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৫০ লক্ষ। আর ভারতে পুষ্টিবিকৃতির ফলে মেদবৃদ্ধিতে ভুগছেন প্রায় ২০ কোটি মানুষ। এঁরা অধিকাংশ গরীব ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ। শিশুবয়স থেকেই এঁদের যে সব খাবার সাধ করে খাওয়ানো হয়েছে—তার ফল এঁদের আজীবন ভুগতে হবে। এঁদের বেশির ভাগ বাস করেন শহরের গরীব-এলাকা ও আধা-শহর অঞ্চলে। ধনী-পরিবারেও মেদরোগ রয়েছে— যার কারণ আলস্য এবং অশিক্ষা। এঁরাও কর্পোরেট খাদ্যবাণিজ্যের চক্করের বাইরে নন। তবে তুলনায় পুষ্টি-সমৃদ্ধ যে সব কর্পোরেট খাবার— তাদের দাম অনেক বেশি। তাদের বিজ্ঞাপিত করা হয় না। যেমন কোক ও পেপসি এবং ডায়েট কোক ও ডায়েট পেপসি। শেষোক্তদের স্বাদ কম, দাম বেশি। শিক্ষিত ও সচেতন ধনীরা সেসব বেছে খান। তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতির পরিমাণ অংশত কমানো যায়।

সুতরাং, ভারতে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে অনাহারকে কম করে তিনগুণ ছাপিয়ে যাচ্ছে পুষ্টিবিকৃতি। কর্পোরেট খাদ্যবাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করলে দুটোকেই কিন্তু কমিয়ে আনা যায়।

ম্যাকডোনাল্ড ও মোহমুক্তি

একুশ শতকে পা দিয়ে সেই কাজটা এখন পশ্চিম-দুনিয়ায় অল্প অল্প করে শুরু হয়েছে।

সংগঠিত আকারে নয়, শুরু হয়েছে একেবারে ব্যক্তিগত স্তর থেকে। এই সচেতনতা সৃষ্টির কৃতিত্ব অবশ্য স্বাস্থ্যনাশক খাবারের রাজাধিরাজ ম্যাকডোনাল্ডের নিজেরই। আমরা সকলেই জানি কোকাকোলার মত ম্যাকডোনাল্ড হল মার্কিনি জীবনযাত্রার আরেক প্রতীক। কোলকাতায় যখন ম্যাকডোনাল্ড পা দেয়নি, তখনো এখানে ম্যাকডোনাল্ড বছরের পর বছর তাদের বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছে— ভবিষ্যতের আশায়। গোটা দুনিয়ার শিশুদের নানা কায়দায় এরা হাত করতে চায়।

লন্ডন শহরে ১৯৯০ সালে এ হেন ম্যাকডোনাল্ডের দোকানের সামনে ওদের খাবারের ক্ষতিকর দিক ও ব্যবসায়িক অসাধুতার বিরুদ্ধে লিফলেট বা প্রচারপত্র বিলি করছিলেন পরিবেশ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত দুজন। প্রচার পত্রের শিরোনাম ছিল What is wrong with McDonald? (ম্যাকডোনাল্ড কেন ক্ষতিকর?)। এই প্রশ্নকে অঙ্কুরে বিনাশ করা দরকার এই ভেবে, ঐ দুই প্রতিবাদী হেলেন স্টিল এবং ডেভ মরিসকে গ্রেপ্তার করে ম্যাকডোনাল্ড জেলে পাঠায় ও মামলা করে। হাইকোর্টকে হাত করে মামলায় ম্যাকডোনাল্ড কোনমতে জিতেও গেল। কিন্তু ফল হল বিপরীত। ম্যাকলাইবেল কেস বা ম্যাক-মানহানি-মামলা সকলের নজর কাড়ল। মানুষ সচেতন হয়ে উঠলেন। লিফলেট ছড়াবার প্রভাব যদি পটকা ফাটানো বলে ধরি, তবে প্রচার-দক্ষতায় এই মামলা হয়ে উঠল অ্যাটম-বোমা! জিতেও কার্যত গো-হারান হারল ম্যাকডোনাল্ড। আর্থিক দিক থেকেও ওদের বেদম ক্ষতি হল। মামলায় ম্যাকডোনাল্ডের সাদা টাকায় খরচ হয়েছিল ১ কোটি পাউন্ড, যার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওরা পেল মাত্র ৪০ হাজার পাউন্ড। কেননা, স্টিল এবং মরিসের অনেক যুক্তি আদালত মেনে নিয়েছিল। সমস্ত বিজ্ঞজনেরা এবার ম্যাকডোনাল্ডের ব্যবসার নানা দিক নিয়ে মতামত দিতে শুরু করলেন। এরপর ২০০২ সালে নিউ ইয়র্ক শহরের দুজন যুবক ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির বিরুদ্ধে আনলেন সরাসরি স্বাস্থ্যনাশকতার অভিযোগ।

নিউ ইয়র্ক শহরের গরীবের মহল্লা ব্রনস্ক এলাকার বাসিন্দা দুটি মেয়ে, জ্যজলিন ব্র্যাডলি আর অ্যাশলি পেলম্যন, অল্প বয়স থেকেই ম্যাকডোনাল্ডের খাবার দেখলে নেচে উঠতেন। জ্যজলিনের পছন্দ ছিল সুপারসাইজ অতিবৃহৎ বার্গার। সকালে বিকেলে দু'বেলাই ঐ খাবারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে সে। আর অ্যাশলির টান ছিল খাবারের সঙ্গে যে সব খেলনা আর পুতুল ম্যাকডোনাল্ডে উপহার হিসেবে পাওয়া যেত, তার লোভ। উনিশ বছর বয়সে সাড়ে পাঁচফুট উচ্চতা আর ওজন ২৭০ পাউন্ড— এই দশায় পৌঁছালো জ্যাজলিন। ১৪ বছর বয়সেই (মাথায় ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি) অ্যশলির ওজন বাড়তে বাড়তে হয়ে গেল ১৭০ পাউন্ড। চিকিৎসক যখন বললেন যে ওদের এই মেদরোগের জন্য ম্যাকডোনাল্ডের খাবার দায়ী, ওরা সরাসরি ম্যাকডোনাল্ডের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিল। ওদের লোভ সংযত করা দরকার ছিল এই অজুহাতে একবছর পর সেই মামলা বাতিল হল। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডের খাবারের স্বাস্থ্যনাশক দিকটাও প্রকট হয়ে গেল। এরপর ২০০৪ সালে Super Size Me এই শিরোনামে একটি তথ্যচিত্র তুলে শোরগোল তুললেন মরগ্যান স্পারলক।

এই চিত্র-পরিচালক পয়লা ফেব্রুয়ারী থেকে দোসরা মার্চ, ২০০৩, পুরো একমাস সারা দিনের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার প্রতিটি খাবার ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে খেয়ে নিজের দেহ এবং মনের ওপর এই খাবারের প্রভাব নথিবদ্ধ করলেন ক্যামেরায়। সারা দিন খাটাখাটনি করেও ২৪ বছরের এই চিত্র-পরিচালকের ওজন একমাসে সাড়ে চব্বিশ পাউন্ড বাড়ল। কোলেস্টেরল বাড়ল ২৩০ ইউনিট, মনমেজাজ এবং শারীরবৃত্তীয় আরো বহু রকমের বিকৃতি তিনি টের পেলেন। প্রতিটি লক্ষণ চিকিৎসক দিয়ে নথিবদ্ধ করালেন এই পরিচালক। এই কাহিল অবস্থা থেকে নিজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে পৌঁছোতে ওঁকে ১৪ মাস কঠোর নিরামিষ ও মাপা আহার করতে হল। এই নিয়েই তৈরী তথ্যচিত্র : **সুপার সাইজ মি**। জনমানসে এর প্রভাব এত তীব্র হয়ে উঠল যে আমেরিকার সার্জেন-জেনারেল গোটা আমেরিকাবাসীকে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও মেদরোগ বিষয়ে সচেতন হবার পরামর্শ দিলেন। অস্কারে তথ্যচিত্র বিভাগে ছবিটি মনোনয়ন পেল। এটি হয়ে উঠল কর্পোরেট খাবারের বিষয়ে একটি চেতাবনি। ম্যাকডোনাল্ড একটি উদাহরণ মাত্র, অসুস্থতা রয়েছে খাদ্য-ব্যবস্থার ও বাণিজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এটা সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল। পশ্চিমের মানুষ এখন সেটা বুঝতে শুরু করেছেন।

এ সবের নিট ফল হল এই যে পশ্চিম দুনিয়ার সংবাদমাধ্যমে এখন খাদ্য ও পুষ্টি নিয়ে, খাদ্য-সংস্কৃতির পরিবর্তন এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর তার প্রভাব নিয়ে লেখা ও অনুসন্ধান অনেক বেড়েছে। এবং এর পাশাপাশি ধীরে ধীরে হলেও সংকুচিত হচ্ছে কোকাকোলা, পেপসি, কেনট্যাকি ফ্রায়েড চিকেন, নেসলস্, ক্যাডবেরি, ম্যাকডোনাল্ড সহ ফ্যাশনফুড ও ফাস্ট-ফুডের বাণিজ্য। কিন্তু তার ফলে এই সব ব্যবসা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে এখন ঝাঁপিয়ে পড়ছে আমাদের মত দেশে। আর উদারনীতি ও বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রচারে আমরা ওদের পাপে নিজেদের প্রতিদিন বেশি বেশি করে জড়িয়ে ফেলছি। পশ্চিমের দেশে ওদের যে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে সেটা ওরা এখান থেকে সুদে-আসলে তুলে নিতে চাইছে। কারণ এই সব খবর আমাদের সংবাদমাধ্যম ছাপেনি। ছাপাবেই বা কেন? এদেশী সংবাদ-মাধ্যমের বিজ্ঞাপনের বেশির ভাগটাই তো আসছে এই সব কোম্পানির বা তাদের সহযোগীদের তহবিল থেকে।

রাঘব বোয়াল

দুনিয়ার খাবারের বাজার কারা শাসন করছে তা না জানলে জনস্বাস্থ্যের ওপর বাড়তে থাকা ক্রমবর্ধমান চাপকে প্রতিহত করা বা বদলাবার উপায় আজ আর নেই। প্রথমে আর পাঁচটা পণ্যের মতো প্রবেশ করে এরা আমাদের দেশের বহুবিচিত্র খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যসংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে চাইছে। এদের একেবারে সামনের সারিতে রয়েছে খাদ্য ও পানীয়ের কারবারি সুপরিচিত কিছু কোম্পানি। অত্যন্ত লাভজনক এই বাজারের ওপর এরা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়। এদের মুখ আমরা সকলেই এত বেশি চিনি যে কখন যেন অজান্তে এরা আমাদের আস্থা অর্জন করে বসে। আমেরিকায় মাত্র দশটি এরকম কোম্পানি যাবতীয় খাদ্যপণ্যের ব্যবসার ৫০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। বিশ্বায়নের সুবাদে বাদবাকি দুনিয়ার খাদ্য বাজারের ১৫ শতাংশ এদের দখলে এসে গেছে— যাকে এরা বাড়াতে আগ্রহী। এই বাড়ানোটা এদের কাছে অত্যন্ত জরুরী, কেননা পশ্চিমে এদের বাজার এখন কমতির দিকে। সেই চাপ ওরা এই নতুন নতুন বাজার দিয়ে সামলাতে চাইছে। ঠান্ডা পানীয়ের দুনিয়াজোড়া ব্যবসার অর্ধেক এর মধ্যেই কোকাকোলা এবং পেপসিকোলার দখলে। বোতলের জলের ব্যবসাও একটু একটু করে এদের হাতেই চলে যাচ্ছে। সুপার মার্কেটে বিক্রি হয় এমন খাবারের ৭৫ শতাংশ হল প্রক্রিয়াজাত খাদ্য— সেগুলোও এইরকম কোনও কোম্পানির উৎপাদন।

বিশ্বের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মোট ৩৩ শতাংশ এখন বহুজাতিক সংস্থার হাতে চলে গেছে। যে কোনো দেশে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বাড়া মানেই এদের

মুঠোয় ধরা পড়া। আপনি নিজে আলাদা করে এই ব্যবসায় নামলে আপনার ব্যবসা লাভজনক হবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা আপনার দরজায় টাকার থলে নিয়ে হাজির হবে, এবং যেন তেন প্রকারে তা কিনে নেবে। প্রথমে আপনার নাম ও লোগো থাকবে, তারপর একটু একটু করে সেটা ওদের লোগো ও নামের অংশ হয়ে যাবে। আগামী দিনে নেসলস-গাঙ্গুরাম, ব্রিটানিয়া-কে সি দাস এর মত লোগো দেখতে পেলে অবাক হবার কিছু নেই (নিছক কাল্পনিক উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য গাঙ্গুরাম বা কে সি দাস মহাশয়েরা আশা করি দোষ নেবেন না)। আসলে দুনিয়ার খাদ্য-ব্যবসা কোনো মুক্ত প্রতিযোগিতার আসর নয়। অর্থনীতির পরিভাষাতেই এই ব্যবসা হল, মনোপলি বা একচেটিয়া না হলেও oligopoly বা গোষ্ঠী-নিয়ন্ত্রিত একচেটিয়া কারবার। কেবল কোকাকোলা দিয়ে ৫০ শতাংশ পানীয় বাজার দখল করা যাবে না, যদি না সঙ্গে থাকে দোসর পেপসিকোলা। ম্যাকডোনাল্ডের পাশে থাকবে বার্গার-কিং, কেনটাকি-ফ্রায়েড চিকেনের পাশে ওয়েন্ডিস বা ভেক্কির চিকেন, ডমিনোস পিৎসার পাশে পিৎসা হাট। এই বাজারে এটাই রীতি। ক্রেতাকে আপাত-বাছাই করার সুযোগ দিতে হবে— এই বাজারের এরকমটাই মনস্তত্ব। সুতরাং আপনি যত ব্র্যান্ড-সচেতন হবেন, যত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ বাড়বে, তত বাড়বে এইসব গুটিকতক বহুজাতিক রাঘব-বোয়ালদের খাদ্যভান্ডার ও পরিসর। এখন শুধু উন্নয়নশীল দেশেই যাদের বাজার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। 'দেখ আমি বাড়ছি মামি'— মামি কিন্তু জানেনা যে বাড়তে থাকা শিশুটি আসলে কে!

এটাও মনে রাখতে হবে যে উন্নয়নশীল দেশের এই বাজার শুধু আকারেই বড় নয় তা অনেক বেশি গভীর। কেননা, তথাকথিত উন্নত বিশ্বের দেশে গড়পড়তা ১৫-২০ শতাংশ আয় মানুষ খাদ্যবাজারে খরচ করে, যেখানে উন্নয়নশীল বিশ্বে তা কম করে ৫০-৬০ শতাংশ! বাজারের এই পরিবর্তনকে ঢাকবার জন্য এখন এক পুষ্টি-রূপান্তরের তত্ত্ব ওরা হাজির করেছে। বলছে — উন্নয়নশীল বিশ্বে আয় বৃদ্ধির জন্য খাদ্যরুচির রূপান্তর ঘটা নাকি অনিবার্য। আসলে সরকারকে পাশে নিয়ে এই রূপান্তর ওরাই মানুষের ওপর চাপাচ্ছে, যার বলি হতে চলেছে দেশের গরীব, মধ্যবিত্ত নাগরিক এবং বিশেষত দেশীয় ব্যবসায়ীরা। Nutritional Transition বা পুষ্টি-রূপান্তরের তত্ত্ব নিছকই ভাঁওতা। রাঘব-বোয়ালরা শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছে!

স্বাস্থ্যনাশকতা

মুনাফার বিষয় ছেড়ে এবার আমরা বহুজাতিক ব্র্যান্ড-শোভিত 'উন্নয়নের-খাদ্যবাজার'-এর একেবারে নির্ভেজাল স্বাস্থ্যনাশক চরিত্রের দিকে নজর দেব। বহুজাতিক খাদ্যবাণিজ্যকে জনস্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞরাই এখন বলছেন মহামারী-সৃজনের কারবার (Manufacturing Epidemics)। যে সব প্রক্রিয়াজাত খাদ্য-পানীয় রকমারী আহামরি রূপ ধরে থরে থরে আমাদের সামনে হাজির করা হয়, তাদের বহুবিচিত্র রূপ, রং এবং গন্ধের মধ্যে আসলে লুকিয়ে থাকে সবচাইতে সস্তা ও কৃত্রিম শর্করা, নুন ও চর্বি। এদের উপাদানের দিকে নজর দিলেই তা টের পাবেন— যদিও তা এত ছোট ছোট হরফে লেখা থাকে যে আতসকাঁচ ছাড়া পড়া শক্ত। ঠিক যেমনটি করা হয়েছিল তামাক সেবনের বিপদের ঘোষণাপত্রে, বা করা হয় ওষুধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া জানান দেবার ক্ষেত্রে। আসলে, এই তিনের কারবারীদের মধ্যে আছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও মিল। যতই লো-ফ্যাট, হৃদরোগ-প্রতিরোধক, ডায়াবেটিস-প্রুফ ইত্যাদি মার্কায় কোম্পানির খাবার সাজানো হোক না কেন, এরা আসলে গুটিকতক রাসায়নিকের মাত্রার উনিশ-বিশ ঘটিয়ে পরিবেশন করার কায়দা, আমরা যার দ্বারা প্রায়শ প্রতারিত হই। শর্করা, নুন, চর্বির ঐ পিন্ড উনিশ-বিশ করে আমাদের নানা কায়দায় গেলানো হয়। জনস্বাস্থ্যের অঙ্কে ক্ষতিটা ধরা পড়ে। সেই পরিসংখ্যানকে কোনোমতেই ফাঁকি দেওয়া যায় না। যদিও তা না জেনে আমরা নিজেদের ভাগ্যের ওপর যখন-তখন দোষ দিই, আসল শত্রুটিকে চিনতে পারি না। যাঁরা ভাগ্যে বিশ্বাস করেন না তাঁরাও, ভয়ে ও বিজ্ঞান (এবং বিজ্ঞাপন) ভক্তিতে ঐ সব লো-ফ্যাট, হৃদরোগ-প্রতিরোধক, ডায়াবেটিস-প্রুফ ব্র্যান্ড, যা আসলে শত্রু, তাদেরকেই আঁকড়ে নিরাপত্তা পেতে চান! আইন চোখ বন্ধ রেখে বা অন্য দিকে তাকিয়ে লজ্জা ঢাকে। গণতান্ত্রিক দেশের জনস্বার্থরক্ষার সমস্ত তালা টাকার চাবিতে খুলেই যারা এ কাজে নেমেছে, তাদের ঠেকায় কে!

যে যে রোগের মড়ক কর্পোরেট খাবারের পদচিহ্ন বলে ধরা যেতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে শিশু-কিশোরদের মেদবাহুল্য, শরীরের অতিরিক্ত ওজনবৃদ্ধি, টাইপ-টু ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, চোখের রোগ, কিডনির বৈকল্য, বন্ধ্যাত্ব এবং বীর্যহানি, আলস্য ও মানসিক অস্থিরতা, এবং সর্বোপরি ক্যান্সার। এরা সবসময়ে যে শুধু কর্পোরেট খাবার খেয়েই ঘটছে এমন নয়। কিন্তু, সামাজিক বিচারে এর বিরাট অংশ ঘটছে এই কারণে। বিশেষ করে আজকের সমাজে শিশু-কিশোর সহ অন্যান্যদের ওজন এবং মেদবৃদ্ধি প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসেবনের একেবারে বুনিয়াদি ফল। ঘরোয়া খাদ্য এবং স্থানীয় খাদ্য অনেক বেশি নিরাপদ, যদিও 'অনুন্নত' বলে তাদের এখন বাতিল করা হচ্ছে। আমাদের স্বাস্থ্যকর্মীরা এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলন এ বিষয়ে সজাগ হলে তা হবে একটা বিরাট কাজ।

উদ্ধারণপুরের দিশা

এ নিয়ে সচেতনতা এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম। আমাদের মত দেশে তা কার্যত অনুপস্থিত। তবু, এই বিতর্কে কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে তিনটি হল প্রধান সুর। **প্রথমটি** বলে, ব্যক্তিগত স্তরে খাদ্য-পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতাই হল বাঁচবার পথ। চেতনা বাড়লে তবেই মানুষ লোভ বর্জন করতে পারবেন ও মানুষের জ্ঞান বাড়লে ও মানুষ স্বাস্থ্য-সচেতন হলে কোম্পানিগুলি আপসে তাদের ভুল শুধরে নেবে। সুতরাং এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আইন বদলাবার জন্য আন্দোলন চালিয়েও ফল হবে না। শুধু গণতন্ত্র, শিক্ষা ও বিজ্ঞানমনস্কতার ওপর ভরসা রাখতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বান কি মুন খাদ্যব্যবসার বিপজ্জনক চেহারা নীতিগতভাবে স্বীকার করেও এমন পথেই চলতে বলেন বিশ্বকে। তিনি বহুজাতিক খাদ্যবাণিজ্যের সংস্থাগুলিকে সমঝে-বুঝে চলার নাম কা ওয়াস্তে উপদেশ দেন। ব্রিটেন ও আমেরিকার সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বক্তব্য মোটের ওপর এইরকম। **দ্বিতীয়** যে সুর শোনা যায় তার মূল আবেদন হল কোম্পানিগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা। ঠিক যেমন করা হয় পি-পি-পি মডেলে (প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক পার্টনারশিপ)। এই মডেল সর্বত্র চালু হলে তখন কোম্পানিগুলি নাকি একতরফা ভাবে গোপন কোনো অপকর্ম করতে পারবে না। তাই যাবতীয় দুর্নীতির মত এই সব বিপদ তখন আপসে কেটে যাবে। এখন দেশে দেশে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে যখন কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে, এবং এক্সপার্ট বা বিশেষজ্ঞরা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন, তখন ছুতো হিসেবে এমন কথা যে বলা হবে সেটাই তো

স্বাভাবিক! এই সুর মূলত এক্সপার্টদের গলাতেই তাই শোনা যাচ্ছে। আর **তৃতীয়** যে সুর শোনা যায় তা প্রথম দুই ধরনের বক্তব্যের বিরোধিতা করে। বলে যে মুনাফা বাড়াবার জন্যই এই সব অপকর্ম করা হচ্ছে, এবং মুনাফা বাড়ানো ছাড়া নিজেদের টিকিয়ে রাখার অন্য কোনো উপায় কর্পোরেটগুলির ঝুলিতে নেই। সদুপদেশ বা ব্যক্তিগত স্তরে নাগরিক সচেতনতা কোনোটাই এদের ঠেকাবার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং, মুনাফা ও সম্পদের বলে এরা এত ক্ষমতাধর যে এদের ওপর লাগাম পড়ানো যথেষ্ট শক্ত। বিশেষত যেখানে রাষ্ট্র ও সরকারকে এরা কার্যত কিনে ফেলছে। তাই জনমত তৈরী করে, জন-আন্দোলনের সবরকম পথে সরকার ও কর্পোরেট খাদ্যব্যবসায়ীদের ওপর যুগপৎ চাপ তৈরী করা ছাড়া গতি নেই। এছাড়াও চাই সাধারণ মানুষ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানকর্মী ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ঐক্য। অন্যদিকে, গড়ে তুলতে হবে বিকল্প। আঞ্চলিক খাদ্যভান্ডার ও খাদ্যব্যবস্থাকে সুসংহত করতে হবে, করতে হবে যুগোপযোগী। একচেটিয়া কারবার নয়, বরং সমবায়ভিত্তিক বৈচিত্র্যময় বিকল্প হল সুস্থায়ী উন্নয়নের পথ, যাকে ইতিবাচক নির্মাণের কর্মসূচী হিসেবে বেছে নিতে হবে।

খাদ্য ও খাদ্য

হিন্দিভাষায় খাদ কথাটির একটি অর্থ হল রাসায়নিক সার, আর অন্যটি ভেজাল। এই বৈপরীত্য হিন্দিভাষী কৃষকদের কান্ডজ্ঞানের ইঙ্গিত দেয়। রাসায়নিক সারকে সোনামাটির খাদ হিসেবেই ওরা দেখেছে। বাংলায় অবশ্য সার নয়, কেবল অসার বা ভেজাল অর্থে খাদ কথাটি বিরাজ করে। এর বিপরীত নিখাদ (খাঁটি) কথাটি বেশ পরিচিত। বাংলায় খাদ শব্দের আরেকটি অর্থ হল পাহাড়ের কিনারায় থাকা নীচু ও ঢালু দিক। যা পতন ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি ইঙ্গিত দেয়। খাদ্যবাজারে উন্নয়নের নামে একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রবেশ দুটি খাদের সঙ্গেই খাদ্যকে যুক্ত করে। কিভাবে সেটা আমরা সংক্ষেপে দেখে নেব।

প্রক্রিয়াকরণের অর্থ খাদ্যকে বাণিজ্যের জন্য রূপান্তরিত করা। একে খাদ্যের অপচয়-রোধের সহায়ক ও প্রযুক্তিগত উপকার হিসেবে আমরা ইতিবাচক চোখে দেখতেই অভ্যস্ত। এর নেতিবাচক দিকটা খুব কম আলোচিত হয়। প্রক্রিয়াকরণের ফলে খাবারকে পচনরোধী করে তুলতে হয়। এর একটি পথ হল তা হিমায়িত করা। আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তা শক্তি অর্থাৎ তেল ও বিদ্যুতের চাহিদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে। আজকের জলবায়ু-পরিবর্তনের যুগে শক্তির চাহিদা আমাদের কমানো খুব দরকার। উপরন্তু আরো নানা কায়দার আশ্রয় নিতে হয়। খাবারকে দ্রুত শুষ্ক করে গুঁড়িয়ে, বা রস অথবা মন্ডে পরিণত করতে হয়। এর ফলে একদিকে যেমন খাবার খাদ্যগুণ হারায়, অন্যদিকে তা বিস্বাদ ও পচনশীল হয়ে ওঠে। তাই পচনরোধী নানা রাসায়নিক খাবার প্রক্রিয়াকরণের প্রতি পর্বে যুক্ত করা হয়। এ সব শরীরের পক্ষে একেবারেই ভালো নয়। কয়েকটি রাসায়নিক রীতিমতো বিষাক্ত জেনেও অল্পমাত্রায় তাদের ব্যবহার করা হয় এই ছুতোয় যে বিপদসীমার নীচে তা প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য ঐ খাবার কতটা খাবো বা সঙ্গে কী কী খাবো তার ওপরে সার্বিক নিয়ন্ত্রণ এবং জ্ঞান থাকা দরকার। ভেবে দেখুন— কখনো কি কোনো কোম্পানি এই দায়িত্ব পালন করেছে? বলেছে— যে এই খাবার এর বেশি খাবেন না, তাহলে শরীরের ক্ষতি হতে পারে? যেটা ওষুধের ক্ষেত্রে করা হয়, সেটা এই সব প্রক্রিয়াজাত খাবারে কেন করা হবে না সেই প্রশ্ন তোলাটাই তো বিজ্ঞানমনস্কতা। অথচ ঐ সব খাবার যত ইচ্ছে তত খাবার জন্য আমাদের প্ররোচিত করা হয়।

প্রক্রিয়াকরণের ফলে খাবারের যে স্বাদহানি হয় তা কাটিয়ে ওঠাবার জন্য এই সব খাবারে বেশি মাত্রায় শর্করা, চর্বি, নুন ও মশলা যুক্ত করা হয়। এরা যে স্বাস্থ্যনাশক তা আমরা এখন জানি। অথচ কোক-পেপসি, বা পটেটো চিপসের বিজ্ঞাপনের কথা ভাবুন। পটেটো চিপস-এর বিজ্ঞাপনে বলা হয় যে স্বাদ এমন যে আপনি অল্প খেয়ে সংযত থাকতে পারবেন না, আপনাকে হামলে পড়ে তা খেতে হবে। অথচ এদের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যা তাতে দু-টুকরো চিপস বড় একদলা আলুভাতের সমান। কোন খাবার মেদবৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস সৃজনের কত সহায়ক তা শুধু তার ক্যালরি দিয়ে নির্ধারিত হয় না, তার চেয়েও এই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স দিয়ে বেশি নির্ধারিত হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ যত দ্রুত ও যত বেশি যে খাদ্য বাড়ায়, সে খাদ্যের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তত বেশি। আন্দোলনের চাপে আমেরিকায় খাদ্য এবং পানীয়ে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স লেখা এখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স না বাড়ালে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপানীয়কে মুখরোচক করার উপায় নেই সেটা আগেই বলেছি। যে নিষ্কাশনের পদ্ধতিতে (এক্সট্রাক্টিভ টেকনলজি) খাদ্যকে পচনরোধী করা হয় তা খাদ্যকে একদিকে যেমন বিস্বাদ করে, অন্যদিকে মানুষের পাচনতন্ত্র তা থেকে পুষ্টি আহরণেও বাধা পেতে পারে। বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উপাদান যা, তার প্রকৃত পৌষ্টিক মূল্য তার চাইতে অনেক কম। পুষ্টিগবেষকরা সেকথা জানলেও তা জনসাধারণের গোচরে আসে না। বরং বিজ্ঞাপনের মোহে বোতলজাত ও প্যাকেটজাত খাবারে আস্থা বেড়ে যায়। আর এই সব বহুবিধ কারণেই প্রক্রিয়াকৃত ও প্যাকেটবন্দী খাবার তাই কখনো স্বাভাবিক স্থানীয় খাদ্যের চেয়ে সস্তা হতে পারে না। ঠিক যেমন রেস্তোরার খাবার ঘরে রান্না খাবারের চেয়ে দামী। কিন্তু একচেটিয়া খাদ্যের কারবার সেই অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে এবং সেটাই করছে দুনিয়ার দেশে দেশে। জানতে চান, কিভাবে?

একায়দাটা এদের কাছে জলভাত। আমাদের চোখের সামনে এসব এদেশেও শুরু হয়ে গেছে। স্থানীয় খাদ্যকে পাইকারি ভাবে কিনে ও ফসল ওঠার আগেই তার আগাম কেনাবেচা করার মধ্য দিয়ে এটা করা হচ্ছে। আলুর সুমঙ্গল-জনক বন্ড কেনা বেচার ফিউচার মার্কেটিং-এর খবর আপনি টেলিভিশন সহ সর্বত্র দেখতে পাচ্ছেন। সমস্ত খাদ্যপণ্যে এটা শুরু হলে কোম্পানির হাতে নেই এমন খাদ্যপণ্য বাজারে বেশ কমে যাবে। সেই খাদ্য নিয়ে টানাটানি শুরু হলে বাজারের নিয়মে তার দাম বাড়তে বাধ্য। তখন সেই বিকৃত দশার বাজারে কোম্পানির হিমঘরে রাখা খাবার ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তুলনায় সস্তা হয়ে উঠবে। শুরু হবে ব্যবসা। কিন্তু এতে নগদ টাকা হাতে নেই এমন গরীব মানুষদের ঠেলে দেয়া হবে আরেক খাদের কিনারায়। যেই খাদ হল— একেবারে পাহাড়িয়া খাদ।

আশার আলো : নর্থ ক্যারেলিয়ার বিকল্প পথ

বিগত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে হৃদরোগী-সংখ্যা এবং এই রোগে মৃত্যুর তালিকার শীর্ষে ছিল ফিনল্যান্ড। অনুসন্ধানে ধরা পড়ল যে ধূমপান, বেশি চর্বি-যুক্ত খাবার খাওয়া এবং শাক-সব্জি না খাওয়া হল এর প্রধান কারণ। এর ফলেই সবরকম হৃদরোগ এবং উচ্চরক্তচাপ-জনিত ব্যাধি দেশটিতে জাঁকিয়ে বসেছে। এ সব ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে ওষুধের দাম কমিয়ে বা হাসপাতালের সংখ্যা বাড়িয়ে সমস্যার মোকাবিলা করবার যে দাবী চিকিৎসকদের দিয়ে তোলায় ফার্মা-কোম্পানি ও মিডিয়া তার হয়ে প্রচার চালায়,

এবং সরকার তাতে সাড়া দেয়, সেই চেনা ছকটা সাহস করে বদলে দিল ফিনল্যান্ডের সরকার। ওরা বলল--- সরকার সমস্যা মোকাবিলার জন্য সামাজিক-স্তরে সচেতনতা তৈরী, অর্থাৎ ধূমপান কমানো, খাদ্যরুচি বদল করা, নিরাপদ খাবার সবার কাছে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা— এই স্থায়ী প্রতিরোধ কর্মসূচী নিয়ে এগোবে। বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা, স্কুল-কলেজ, সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী সবাইকে নিয়ে ধাপে ধাপে শুরু হল দেশব্যাপি কর্মসূচী।

এই গঠনমূলক বিকল্প কর্মসূচী শুরু করা হয়েছিল উত্তর ক্যারেলিয়া এলাকা থেকে, যেখানে গরীব মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আর হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যাও সবচেয়ে বেশি। এখানেই পাইলট প্রজেক্ট শুরু হল। এ থেকেই কর্মসূচীটির নাম দেওয়া হল নর্থ ক্যারেলিয়া প্রজেক্ট। প্রচারের পাশাপাশি, তামাকের, সিগারেটের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা, ক্ষতিকর ভোজ্যতেল সরিয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল তেলের ব্যবহারের পক্ষে প্রচার, খাদ্যতালিকার পরিবর্তন ও তার কারণের ব্যাখ্যা করা— এসব লাগাতার চলল। এর ফলাফল যা দেখা গেল তা চমকপ্রদ, একেবারে ম্যাজিকের মত। হৃদরোগ ৬৫ শতাংশ কমে গেল, নাগরিকদের গড়পড়তা আয়ু ৭ বছর বাড়ল! দুনিয়ার সামনে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীর সাফল্যের এমন নজির খুব কমই আছে। গৃহবধুরা এই প্রচারে মুখ্য ভূমিকা নেন। নর্থ ক্যারেলিয়ার সাফল্যের প্রমাণ পেয়ে এরপর ধাপে ধাপে গোটা ফিনল্যান্ডে এই কর্মসূচী ছড়িয়ে দেওয়া হল।

আমাদের মিডিয়া এ সব ভালো খবর আমাদের দেয় না কেন? এই আলোচনায় কারণটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই। খাদ্য বাজার, তামাকের কারবার, ঠান্ডা ও 'গরম' পানীয় (মদ), ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিমা এসবের পুরোটাই দখল করে আছে নানা কর্পোরেট গোষ্ঠী। মানুষ দামী কুখাদ্য খেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রোগের খপ্পরে পড়লে এদের মোট মুনাফা বাড়ে বৈ কমে না। তাই সমাধানের নাম করে, সমস্যার শিকড় না উপড়ে ওষুধের গবেষণা ও চিকিৎসাতন্ত্র বাড়বার মানসিকতা গড়ে তোলা হচ্ছে। কর্পোরেট মিডিয়া— এই মানসিকতা তৈরীর ও মগজ ধোলাইয়ের হাতিয়ার।

কিন্তু সমস্যার পাকে আমেরিকা নিজেও বড্ড বেশি জড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বের সব চাইতে বেশি মেদরোগী রয়েছে আমেরিকায়। আমেরিকায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এখন বিপর্যস্ত। যেখানে যত বেশি গরীব, সমস্যা সেখানে তত প্রকট। ওবামা এই সমস্যাটিকে ভোটে জেতার মূলধন করে তুলেছেন— যা তার বিপক্ষ পারেনি। কিন্তু, আজ না হোক কাল, আমেরিকাকেও নর্থ ক্যারেলিয়ার কাছ থেকে প্রকৃত সমাধানের পথ শিখতে হবে।

নিউ ইয়র্ক শহরের স্বাস্থ্য-আধিকারিকরা সেই পথে হাঁটতে শুরু করেছেন। সেখানে কোকা-কোলা, পেপসি-কোলা, পট্যাটো চিপস, ও চর্বি-বহুল বার্গারের মত খাবার বিক্রি স্কুল চত্বরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাবার কী, এবং কোন খাবার স্বাস্থ্যনাশক, সেই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে স্কুলে। আইন করে স্বাস্থ্যনাশক খাদ্য-পানীয়ের বিক্রিতে সতর্কতার বার্তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। আশা করা যায় নিউ ইয়র্কের এই কর্মসূচী থেকে আমেরিকায় বদল শুরু হবে। আমেরিকা চাইলে দ্রুত বদলাতে পারে নিজেকে, যার প্রমাণ অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে। সেটা ঘটবার আগেই ভয়ে ভয়ে তাই স্বাস্থ্যনাশকতার ব্যবসা নিজেকে এখন ছড়িয়ে দিতে চাইছে উন্নয়নশীল দুনিয়ায়, যেখানে কোনো কিছু অত দ্রুত বদলায় না। তাই আমাদের উচিত কর্পোরেট খাদ্যের বহুমুখী প্রবেশ ও বিস্তারকে এ দেশে যত দ্রুত সম্ভব রুখে দেওয়া।

নর্থ ক্যারেলিয়ার প্যাকেটজাত খাবার, পানীয়, সিগারেট সরিয়ে বিকল্প নিরাপদ খাদ্যপানীয়ের প্রচলন মাত্র ২৩ বছরে হৃদরোগের মৃত্যুর সংখ্যা ৭৫ শতাংশ কমিয়ে এনেছে। এই আশার বার্তা এ দেশের যাত্রাপথে বিরাট ভূমিকা নিতে পারে।

খাদ্যাখাদ্য-বিনিশ্চয়

বিশ্বায়নের প্রসার এবং বিশ্ব-পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট—এই দুয়ের যোগফল হিসেবে ইন্ডিয়া ইনক ও কর্পোরেটেরা আজ ভারত দখলে নেমে পড়েছে। কৃষি-খাদ্য এবং বাজারকে গ্রাস করতে এরা উদ্যত। উন্নয়ন এদের হাতে এখন এক প্রধান অস্ত্র। সরকার কৃষিপণ্য ও খাদ্যবাজারের এই দখল মেনে নিয়েছে বলেই বাধ্য হয়ে এর নির্মমতা সাময়িকভাবে ঠেকাবার জন্য, আপাতত ভোটদাতাদের নিছক বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের খাদ্যের অধিকারের দাবী মানতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এটা যে কোনো সুরাহা নয় তা আমাদের বুঝতে হবে। পশ্চিমের অভিজ্ঞতা থেকে খাদ্যের অধিকারের দাবীর সঙ্গে, নাগরিক সমাজের তরফ থেকে তাই যুক্ত হোক স্বাস্থ্যনাশক খাদ্য বাতিল করার দাবী, প্রাকৃতিক ও বিষমুক্ত খাবারের দাবী ও খাদ্য নিয়ে একচেটিয়া কারবার বন্ধ করার দাবী।

খাদ্যবাজারে একচেটিয়া কারবারীদের প্রবেশ এবং ব্র্যান্ডেড বা নামজাদা দেশি-বিদেশি কোম্পানির ছাপমারা বেশি দামের নির্ভরযোগ্য খাবারের স্বাস্থ্যনাশক চরিত্র দুটোই বিরাট দুটি বিষয়। এর অল্প কয়েকটি দিক নিয়েই এখানে আলোচনা করলাম। আর বাইরেও আরো বহু বিপদের কথা রয়েছে, যা অনালোচিত থেকে গেল। সতর্ক ও সজাগ থাকলে পাঠকরা নিজেরাও এ নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন। কেননা আজকের যুগে এইসব বিপদের কারবার প্রায় চোখের সামনেই করা হয়। তথ্য থাকে— শুধু মানুষের নজর অন্য অবান্তর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

সবশেষে আর একটা কথাও বলে নেওয়া দরকার। প্রযুক্তির প্রয়োগের বিরোধী কোনো সনাতনী মনোভাব থেকে এই আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে গুটিকতক কর্পোরেটের হাতে খাদ্যব্যবস্থা তুলে দিলে যে মারাত্মক বিপদ আমরা আজ দেশের ওপর চাপাবো সেটা যে পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের চেয়েও অনেক বড় দুর্ঘটনা হয়ে উঠবে সেটা ভুললে চলবে না। যে সব প্রযুক্তির হয়ে মিডিয়ায় নিত্যদিন সাফাই গাওয়া হচ্ছে, তাদের সাহায্য না নিয়ে কর্পোরেট কোম্পানিগুলি যে ভারতের খাদ্যব্যবস্থা দখল করতে পারবে না সেটাও আমরা বুঝতে পারছি। ওপর থেকে চাপানো প্রযুক্তির নির্দিষ্ট কুফল ও বাস্তবিক নেতিবাচক দিকের ওপরেই তাই এই আলোচনায় বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কৃষক ও প্রান্তিক মানুষেরা আজ যে বিপদের মুখে পড়েছেন, তার সমাধান করতে হবে সুস্থায়ী ও সমবায়মূলক কৃষি ও সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে— সেটা অন্য-এক আলোচনার বিষয়। একচেটিয়া বাণিজ্যসংস্থার নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রযুক্তির জনমুখী ও বহুমুখী বিকাশই আগামীদিনে খাদ্যের পরিমাণ ও গুণের নিশ্চয়তার একমাত্র চাবিকাঠি।

লেখক পরিচিতি : ড. তুষার চক্রবর্তী, পি এইচ ডি অণুজীববিজ্ঞানী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মজীবন শুরু করেন। দেশে ফিরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজিতে বিজ্ঞানী হিসেবে যোগ দেন; বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সমাজের আর্ন্তসম্পর্কের নানা দিক নিয়ে কাজ ও লেখালিখি করেন। বাংলায় প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে 'জিন: ভাবনা দুর্ভাবনা' অন্যতম।

রক্ত নিয়ে

জীবনগাথা-মরণকথা (পর্ব-২)

*রক্তদান মহাদান এটা আমরা সবাই জানি। ২৩শে বা ২৬শে জানুয়ারি কিংবা ১৫ই আগস্ট পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়, আমরা অনেকেই গিয়ে রক্ত দিই, তারপর লাল কার্ড আর এক প্যাকেট খাবার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। কিন্তু কেন দিলাম বা যা দিলাম, সেটা নিয়ে কি করা হল সে সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা খুব বেশি মানুষের বোধ হয় নেই। তাছাড়া, আমি চাইলেই কি রক্ত দিতে পারি? এই সব প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে গেলে প্রায় একটি মহাভারত লিখতে হয়, কিন্তু বুঝতে চাইলে বোধ হয় পুরোটাই বোঝা উচিৎ। তাই, আসুন, একটা চেষ্টা করা যাক, বলছেন—***ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়।**

[আগে যা জেনেছি - রক্ত দেওয়া ছাড়া অনেক রোগের কোনও চিকিৎসাই নেই, আর রক্তের মূল উপাদানগুলি আজ পর্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে হয় তৈরি করা যায় নি, বা গেলেও তা ভয়ানক ব্যয়বহুল। সুতরাং এক মানুষের প্রয়োজনীয় রক্ত আরেক মানুষের শরীর থেকেই নিতে হবে। তবে রক্তদাতার শরীরে যেন এমন কোনও রোগ না থাকে যা রক্তগ্রহীতার শরীরে চলে যেতে পারে, সেটা দেখে তবেই রক্তদান শিবিরে রক্তদাতা বাছা হয়। একজনের রক্ত অন্য কারো শরীরে দেবার সময়ে মনে রাখতে হবে যে সেটি নতুন শরীরে গিয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তাই রক্তের গ্রুপ না মিলিয়ে, ক্রস ম্যাচ না করে, রক্ত দেওয়া যায় না। চিকিৎসার কারণে রক্ত দেওয়ার সময় ভুল গ্রুপের রক্ত দিলে যে বিপদ ঘটতে পারে, প্রায় সেরকম বিপদ ঘটে গর্ভাবস্থায়, যদি মায়ের শরীরে Rh-ve রক্ত থাকে আর তাঁর গর্ভস্থ শিশুর শরীরে থাকে Rh+ve রক্ত—এসব ক্ষেত্রে আগেভাগে রক্তের গ্রুপ জেনে নিয়ে প্রতিষেধক চিকিৎসা করতে হবে।]

এর আগের সংখ্যায় স্বাস্থ্যের বৃত্তে আমরা দেখেছি, **ইচ্ছে হলেই রক্ত দাতা হওয়া যায় না, রক্তদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কয়েকটা যোগ্যতামান পেরিয়ে আসতে হয়।** তাঁর মেডিক্যাল ইতিহাস নেওয়া হয় কিছু প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে। প্রশ্নগুলি করেন ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মচারী, যদি কোনও প্রশ্নের উত্তরে কিছু সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া যায় তখন উপস্থিত চিকিৎসক সেই দাতাকে পরীক্ষা করেন এবং স্থির করেন তিনি রক্ত দিতে পারেন কি পারেন না।

মেডিক্যাল ইতিহাস সংগ্রহের প্রশ্নাবলীর একটি নমুনা এখানে দেওয়া হল :

১। আপনার স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাবে ভাল তো?
২। কতক্ষণ আগে খেয়েছেন?
৩। আপনি কি কোনও ওষুধ খান রোজ?
৪। সম্প্রতি কি কোনও টিকা নিয়েছেন?
৫। কখনও কি এপিলেপ্সি বা অন্য কোনও কারণে খিঁচুনি হয়েছিল? কোনও মানসিক রোগ আছে? তার জন্য ওষুধ খান?
৬। জন্ডিস হয়েছে কখনও বা লিভারের অসুখ? **(টাইপ A ছাড়া অন্য ভাইরাল হেপাটাইটিস হয়ে জন্ডিস হবার ইতিহাস থাকলে সেই**

ব্যক্তি কোনোদিনই রক্ত দিতে পারবেন না, তবে জন্ডিসের কারণ যদি গল স্টোন হয় তাহলে কোনও বারণ নেই।]
৭। জন্ডিসে আক্রান্ত কোনও রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন গত ছয় মাসের মধ্যে? (উত্তর হ্যাঁ হলে এক বছর রক্ত দেওয়া যাবে না)
৮। কখনও হেপাটাইটিস বি বা সি টেস্ট পজিটিভ এসেছে আপনার?
৯। এইডস (AIDS) সম্বন্ধে কিছু জানা আছে?
১০। কখনও কি এইচ-আই-ভি (HIV) টেস্ট পজিটিভ এসেছে আপনার?
১১। আপনার সঙ্গে এইডস থাকতে পারে এমন কোনও ব্যক্তির যৌনসম্পর্ক হয়েছে কি? হয়ে থাকলে, সেই সময়ে কি কনডোম ইত্যাদির সাহায্যে উপযুক্ত সুরক্ষা নেওয়া হয়েছিল? (কেবল পুরুষমানুষের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্ন—অন্য কোনও পুরুষমানুষের সঙ্গে সমকামী যৌন সম্পর্ক হয়েছিল)।
১২। গত ছয় মাসে কি বিশেষ ভাবে ওজন কমেছে? এছাড়া মনে রাখতে হবে—

- অন্তঃসত্ত্বা মহিলা বা সদ্যোজাত সন্তানের মা সন্তান জন্মের ছয় মাসের মধ্যে রক্ত দিতে পারবেন না; গর্ভপাতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যে মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনি রক্তদান করবেন না।
- দাঁত তোলার মত সাধারণ ঘটনাতেও তিন দিনের মধ্যে রক্ত দেওয়া যাবে না, আর যদি দাঁতের কোনও অপারেশনে অ্যানেস্থেসিয়া করা হয়ে থাকে, তা হলে এক মাস অপেক্ষা করতে হবে। ছোটোখাটো কোনও সার্জারির ক্ষেত্রে তিন মাস, বড় অর্থাৎ মেজর সার্জারির ক্ষেত্রে ছয় মাসের মধ্যে রক্ত দেওয়া যাবে না। সার্জারি যদি শরীরের কোনও ক্যান্সারের জন্য হয়ে থাকে তা হলে কোনোদিনই রক্ত দেওয়া যাবে না। একই ভাবে হার্টের কোনও রকম অসুখ থাকলে বা ডিজিটালিস জাতীয় ওষুধ খেলে রক্ত দেওয়া যাবে না। তবে যাঁরা উচ্চ-রক্তচাপে ভোগেন, তাঁদের রক্তচাপ যদি ওষুধ খেয়ে ঠিক থাকে, তাহলে কোনও অসুবিধা নেই।
- এপিলেপ্সির রোগীদের ক্ষেত্রে যদি ওষুধ চলে অথবা গত দুবছরের মধ্যে খিঁচুনি হয়ে থাকে তা হলে তাঁরা রক্তদাতা হিসেবে আনফিট।
- রক্তদাতা যদি নিজে রক্ত অথবা কোনোরকম রক্তাংশ (blood component) নিয়ে থাকেন তাহলে এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।
- **যক্ষ্মা হয়ে থাকলে চিকিৎসা সম্পূর্ণ হওয়ার পর পাঁচ বছরের মধ্যে রক্ত দেওয়া যাবে না।**

- **কিডনির ক্রনিক অসুখ থাকলে রক্ত দেওয়া যাবে না।**
- টিকা এবং ওষুধের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা আছে, কোনটির ক্ষেত্রে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে রক্ত দেওয়ার জন্যে বা আদৌ দেওয়া যাবে কি না।
- হিমোফিলিয়া জাতীয় অসুখ যেখানে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয় সেই অসুখে কোনোদিনই রক্ত দেওয়া যাবে না।
- থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার-দের (যাঁদের থ্যালাসেমিয়া রোগের একটিমাত্র জিন আছে) ক্ষেত্রে যদি হিমোগ্লোবিন লেভেল ঠিক থাকে তাহলে কোনও বাধা নেই রক্ত দিতে। যদিও থ্যালাসেমিয়া একটি রক্তের অসুখ, কিন্তু থ্যালাসেমিয়া যাঁরা বহন করছেন তাঁদের রক্ত নিলে থ্যালাসেমিয়া হয় না। অপরপক্ষে, এইচ-আই-ভি বা কোনও রকম ক্যান্সারের রোগীদের ক্ষেত্রে কোনও চান্স নেওয়া হয় না, পাছে গ্রহীতার শরীরে রোগটি পৌঁছে যায়।
- রক্তদানের অভিলাষ নিয়ে যিনি এসেছেন তিনি কি করেন সেটাও জানতে হবে। এরোপ্লেন চালাবার কাজ, ভারি গাড়ি চালাবার কাজ বা বহুতল বাড়ি তৈরির কাজ করেন যাঁরা, তাঁরা রক্ত দেওয়ার বারো ঘন্টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে পারবেন না।
- একবার রক্ত দেওয়ার পর বারো সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে দ্বিতীয়বার দেওয়ার জন্য। তবে একবছরে তিনবারের বেশি রক্ত দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ।

এতো গেল ইতিহাস। এবার ভূগোল। অর্থাৎ রক্তদাতার ডাক্তারি পরীক্ষা করতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮-৬০ বছরের মধ্যে, শরীরের ওজন উচ্চতা অনুযায়ী যথাযথ হতে হবে (কম পক্ষে ৫০ কেজি), পালস, রক্তচাপ স্বাভাবিক হতে হবে। এরপর দেখা হবে হিমোগ্লোবিন, অর্থাৎ দাতা নিজেই অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত কিনা। ১২.৫ গ্রাম% এর কম হিমোগ্লোবিন হলে রক্ত দেওয়া যাবে না। এর পর দাতার গ্রুপ নির্ণয় করা হবে। রেকর্ডে দাতার অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন এবং গ্রুপ-ও নথিভুক্ত করা হবে।

রক্তদান শিবির

রক্ত সংগৃহীত হয় প্লাস্টিকের ব্লাড ব্যাগে, সেটির মধ্যে বিশেষ রক্ততঞ্চনরোধক কেমিক্যাল (anti-coagulant) দেওয়া থাকে যাতে রক্ত জমাট না বাঁধে। ব্যাগটি জীবাণুমুক্ত এবং সীল করা থাকে। অর্থাৎ ব্যাগের সঙ্গে লাগানো সূঁচের মাধ্যমে ব্যাগের মধ্যে রক্ত সংগৃহীত হবে এবং সেটি কোনোভাবেই খোলা যাবে না। দাতার ওজন যদি ৫০ কিলো হয় তবে ৩৫০ মিলি; আর যদি ৬০ কিলোর বেশি হয় তবে ৪৫০ মিলি রক্ত নেওয়া যাবে। এছাড়া দাতার রক্তের নমুনা হিসাবে সঙ্গের পাইলট টিউবেও কিছুটা রক্ত সংগ্রহ করা হয় যা দিয়ে নানা সংক্রামক রোগ আছে কিনা তা দেখতে স্ক্রীনিং পরীক্ষাগুলি হবে, এবং রক্তটি গ্রহীতার শরীরে দেবার ঠিক আগে ক্রস-ম্যাচিং এর জন্য ব্যবহৃত হবে। সূঁচটি দাতার শিরার মধ্যে প্রবেশ করানোর পর যখন রক্ত বেরিয়ে ব্যাগে জমা হচ্ছে তখন ব্যাগটি একটি ওজন-যন্ত্রের ওপর রাখা থাকে। ১ মিলি রক্তের ওজন ১.০৫ গ্রাম, সুতরাং ৩৫০ মিলি = ৩৬৭ গ্রাম বা ৪৫০ মিলি = ৪৭২ গ্রাম; এভাবে এই ওজন যন্ত্রটিই বলে দেয় কখন থামতে হবে। দাতার শরীর থেকে রক্ত সংগ্রহ হয়ে যাবার পর তিনি ৮-১০ মিনিট শুয়ে থাকবেন ও তত্ত্বাবধানে থাকবেন। তার পর ধীরে ধীরে উঠে বসবেন এবং কিছু খাবার খাবেন। রক্তদানের পর কখনও কখনও দুর্বল লাগতে পারে, মাথা ঝিমঝিম করতে পারে, সঙ্গে ঘাম হতে পারে, কখনও বা মূর্ছা যেতেও পারেন। এই কারণেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে বলা হয় ও কিছু খেতে হয়, তবুও যদি এরকম কিছু ঘটে উপস্থিত কর্মীরা জানেন এক্ষেত্রে কি করণীয় আর এই দলে একজন চিকিৎসক তো আছেনই, সুতরাং চিন্তার কিছু নেই।

সংগৃহীত রক্ত নানা রকম পরীক্ষানিরীক্ষার পর রোগীকে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়—সরাসরি, অথবা তাকে ভেঙে বিভিন্ন রক্তাংশ (component) তৈরি করার পর। রক্তাংশ তৈরি আর তার ব্যবহার নিয়ে আমরা পরে আবার আসব; আপাতত 'ফাস্ট ফরোয়ার্ড' বোতাম টিপে আমরা চলে যাব এর পরের ধাপে, যেখানে রোগীকে রক্ত দেওয়া শুরু হয়েছে অথবা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে...। অতঃ কিম?

রক্তগ্রহণের নিয়ম ও সংক্রমণ

রক্তদান মহাদান...। রামের রক্তে বেঁচেছে রহিম...। এসবই খুব সত্যি কথা। কিন্তু একটা ভীষণ জরুরী আর প্রাথমিক কথা মাথায় রাখতে হবে। একজন মানুষের শরীর থেকে সংগৃহীত রক্ত যখনই অন্য আর একজন মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হবে তখনই আর তা শুধু রক্ত থাকবে না, হয়ে যাবে একটা ওষুধ বা ড্রাগ। ওষুধের ওপর প্রযোজ্য যাবতীয় বিধিনিষেধ-নিয়মকানুন এই রক্তের ওপরও প্রযোজ্য হবে। এটা যদি একটা ওষুধ হয়, আর পাঁচটা ওষুধের মতো এই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হতে পারে। আমরা এর আগে রক্তের গ্রুপ না মেলানোর ফলে কী কী ক্ষতি হতে পারে সেটা দেখেছি, এবার দেখব রক্তের মাধ্যমে কি কি সংক্রমণ ঘটতে পারে।

প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক যে সব জীবাণুবাহিত রোগ রক্তের পথ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে অথবা রক্তের কোষগুলিতে বাসা বানিয়ে থাকে, সেগুলি সবই একজন অসুস্থ মানুষের শরীর থেকে নেওয়া রক্তের মাধ্যমে একজন সুস্থ মানুষের শরীরে সংক্রামিত হতে পারে। এখানে 'সুস্থ' বলতে ওই বিশেষ সংক্রমণ শরীরে নেই, একথাই বলা হচ্ছে, না হলে কখনই পুরো সুস্থ মানুষকে রক্ত দেওয়া হয় না, সেটা হবে একেবারেই সুস্থ লোককে ব্যস্ত করার সামিল। **এই অসুখগুলির মধ্যে পড়ে ম্যালেরিয়া, ভাইরাল হেপাটাইটিস টাইপ বি এবং সি, সিফিলিস এবং এইচ আই ভি সংক্রমণ।** এই রোগগুলির প্রতিটিই নানারকম জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, তারা যথেষ্ট কষ্ট, এমনকি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। ম্যালেরিয়া বা সিফিলিস বাদে অন্য রোগগুলির চিকিৎসা মোটেও সহজ নয়, ম্যালেরিয়াও মাঝে মধ্যে বিপদ ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। তাই রোগ হবার আগেই তাকে ঠেকানো ভাল—prevention is better than cure। সংগৃহীত রক্ত যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করলে সাধারণত সংক্রমণ আছে কি না তা ধরা পড়ে, সুতরাং রক্তদানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এই রোগগুলি হওয়া উচিৎ নয়। কিন্তু, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, রক্তের সংক্রমণ রক্তদানের সময় চিহ্নিত করা যায় না। রক্তদাতার শরীরে জীবাণু প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার বিরোধী 'অ্যান্টিবডি' তৈরি হয় না, আর আমরা ওই 'অ্যান্টিবডি'-টি আছে কিনা সেটাই সাধারণত দেখে রোগনির্ণয় করি; ফলে সংক্রমণের এই প্রথম দশায় জীবাণুর উপস্থিতি বুঝতে পারি না। কিন্তু জীবাণুবাবাজী তো বহাল তবিয়েতে বর্তমান, অতএব আপাত-নির্দোষ রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ প্রবেশ করে। তবে শুধু যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্ত দেন, তাঁদের থেকেই রক্ত নিলে এবং যথাযথভাবে

পরীক্ষা করলে এই ধরনের সংক্রমণের হার খুব কমানো সম্ভব। যাঁরা জীবিকানির্বাহের জন্য রক্তদান করেন এবং যাঁরা মাদকাসক্ত তাঁদের রক্ত পরিহার করতে হবে।

রক্তগ্রহণ নিয়ে আরও কিছু দরকারি কথা

❖ থ্যালাসেমিয়া জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে, **যাঁদের নিয়মিত রক্ত দিতে হয়, তাঁদের সমস্যা অনেক বেশি, এবং বিশেষ ধরনের। বারবার রক্ত নেবার ফলে এঁদের শরীরে লোহার মাত্রা বিপদসীমার উপরে চলে যায়।** এই লোহা জমা হয় হৃৎপিণ্ড, লিভার এবং অগ্ন্যাশয়ে, ও এই যন্ত্রগুলির কাজে বাধা সৃষ্টি করে। বস্তুত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসায় শরীরে জমতে থাকা লোহা বার করার ব্যবস্থা না করলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটতে পারে। সুতরাং নিয়মিত রক্তদানের এটি একটি খুবই বিপজ্জনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।

❖ আচ্ছা, শরীর থেকে মাত্রাতিরিক্ত রক্ত বেরিয়ে গেলে রক্তই দিতে হবে রোগীকে বাঁচাতে গেলে, সেটাতো প্রতিষ্ঠিত করা গেছে, তা হলে প্রবল রক্তক্ষরণ হলে স্টকে থাকা প্রচুর রক্ত রোগীকে দিলেই কি তিনি বেঁচে যাবেন? না, তার আবার অন্য বিপদ আছে। রক্তের মধ্যে লোহিত কণিকাগুলিই হল তুলনায় দীর্ঘজীবী, বাকি আর সব প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিই স্বল্পায়ু, সুতরাং প্রচুর রক্ত দিলে বাইরের রক্তের দ্বারা রোগীর নিজস্ব রক্তের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ডাইলিউটেড হয়ে গিয়ে উলটো বিপত্তি ঘটে। রাজনীতিবিদ প্রমোদ মহাজনের মৃত্যু এইভাবেই হয়েছিল।

❖ রক্ত একটি খুব মূল্যবান ওষুধ। তার সুনির্দিষ্ট প্রয়োগ হওয়া উচিত, মশা মারতে কামান দাগলে কামানের গোলার অপচয় হয়, আর গোলার ঘা নিজেকেই ঘায়েল করতে পারে। এক বোতল রক্ত দিলে রোগীর মাত্র ১ গ্রাম% হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি পায়, সুতরাং **কোনো অপারেশনের আগে এক বোতল রক্ত দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।** এতে রোগীর কোনো উপকার হল না, তাঁর রক্তগ্রহণজনিত ব্যধির সম্ভাবনা সামান্য হলেও বাড়ল, এবং একটা ব্লাড-কম্পোনেন্ট তৈরি করার সোর্স অপচয় করা হল।

❖ এই ব্লাড-কম্পোনেন্ট ব্যাপারটা কি? দাতার থেকে যে রক্ত সংগ্রহ করা হয় তা হল সম্পূর্ণ রক্ত (whole blood), এটা থেকে নানা অংশ তথা 'কম্পোনেন্ট' আলাদা করে নেওয়া হয়। এইভাবে **সম্পূর্ণ রক্তের নানা অংশ আলাদা করে নিলে কম্পোনেন্টগুলির জীবনকালের পরিধি আরও বাড়ানো যায়, আর যাকে যা দেবার দরকার নেই তাঁকে তা দিয়ে অপচয় করা হয় না।** সম্পূর্ণ রক্ত দেবার চব্বিশ ঘন্টা পরে সে-রক্তে খুব কম সংখ্যক

অণুচক্রিকা কার্যকর থাকে, রক্ত তঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্যাক্টরগুলির মাত্রাও কমে যায়। কিন্তু নানা অংশ তথা 'কম্পোনেন্ট' আলাদা করে নিলে অণুচক্রিকা ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পাঁচ দিন রাখা যায় আর 'ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা' (রক্তরস) মাইনাস ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এক বছর রাখা যায়। রক্তাল্পতায় ভুগছেন যিনি, তাঁর লোহিত কণিকাই দরকার, অণুচক্রিকা নয়, প্লাজমাও নয়। তাঁকে সম্পূর্ণ রক্ত দিলে অনর্থক শরীরে প্লাজমা ঢোকে, লাভ তো হয়ই না, বরং দুর্বল হৃদযন্ত্র প্লাজমার ভার বইতেও পারে না। অতএব এই রোগীকে দু-তিনটি ইউনিট বা ব্যাগ রক্ত থেকে শুধু লোহিতকণিকা আলাদা করে নিয়ে কেবল লোহিতকণিকা দিলে অনেক বেশি সংখ্যায় লোহিতকণিকা দেওয়া যাবে। প্লাজমা বা অণুচক্রিকা অপচয় করা হবে না; এই অণুচক্রিকা যে রোগী অণুচক্রিকার অভাবজনিত রক্তপাতে (যেমন ITP নামক অসুখে) ভুগছেন তাঁকে দেওয়া যাবে, আর ওই প্লাজমা আর একজন হিমোফিলিয়া রোগীর প্রাণ বাঁচাবে। আধুনিক ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের কম্পোনেন্ট আলাদা করার ব্যবস্থা থাকে। রক্ত সংগ্রহের ছয় ঘন্টার মধ্যে আলাদা করার কাজটা করে ফেলতে হয়।

❖ **টাটকা রক্ত** (fresh blood) **একজনের শরীর থেকে নিয়ে আরেকজনকে দেওয়া খুব ভাল—এমন একটা ধারণা চালু আছে। এটা ঠিক ধারণা নয়।** টাটকা রক্তে অণুচক্রিকা, দানাযুক্ত শ্বেতরক্তকণিকা, ও রক্ততঞ্চনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান থাকে সেটা সত্যি কথা, কিন্তু যদি ঐ বিশেষ জিনিসগুলোর দরকার হয় তবে ঐ সব ব্লাড-কম্পোনেন্ট আলাদা করে দেওয়াই ভাল। ব্লাড-কম্পোনেন্ট বা রক্তাংশের কথায় একটু পরেই আসব। টাটকা রক্তের সমস্যা হল সেটা নিয়ে সব দরকারি পরীক্ষা করা হয় না, এবং এ থেকে রক্ত গ্রহণজনিত 'গ্রাফট-বনাম-গ্রহীতা রোগ' (Graft versus Host Disease) হতে পারে।

❖ রক্তগ্রহণ-জনিত গ্রাফট-বনাম-গ্রহীতা রোগের মূলে থাকে দাতার লিম্ফোসাইট গোত্রের শ্বেতরক্তকণিকা, যারা গ্রহীতার দেহে গিয়েও বেঁচে থাকতে সক্ষম। এই রোগের লক্ষণ হিসেবে রক্তগ্রহীতার শরীরে জ্বর, ত্বকে র‍্যাশ, লিভারে প্রদাহ, ডাইরিয়া, অস্থিমজ্জায় রক্তকণিকা তৈরি কমে যাওয়া, নানাধরণের সংক্রমণ—এসব ঘটতে পারে, মৃত্যুও অসম্ভব নয়। **সব রক্তগ্রহীতার গ্রাফট-বনাম-গ্রহীতা রোগ হবার সম্ভাবনা সমান নয়।** এ রোগ সাধারণত অনাক্রম্যতা-অক্ষম (immunodeficient) রোগীদের ক্ষেত্রে ঘটে; তবু অন্যান্য মানুষের ক্ষেত্রেও তা ঘটতে পারে। যে রোগীর অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপিত হয়েছে; যেসব বাচ্চাকে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন অবস্থাতেই রক্ত দিতে হয়েছে, বা নিজের রক্ত সম্পূর্ণ ফেলে দিয়ে অন্য রক্ত দিতে হয়েছে (exchange transfusion); গর্ভকাল পূর্ণ হবার আগে যেসব বাচ্চা জন্মেছে—এদের গ্রাফট-বনাম-গ্রহীতা রোগের সম্ভাবনা বেশি, তাই রক্ত দেবার আগে সেই রক্তের ওপর গামা-রশ্মি প্রয়োগ করে দাতার রক্তের লিম্ফোসাইট গোত্রের শ্বেত রক্ত- কণিকাগুলিকে খানিকটা কমজোরি করে দেওয়া দরকার। গামা-রশ্মি প্রয়োগ করার ব্যবস্থা সর্বত্র নেই। সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতার কোনও ব্লাড ব্যাঙ্কে এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রটাই নেই। তাই এখানে গামা-রশ্মি প্রযুক্ত রক্ত যেসব রোগীর দরকার সেখানে 'শ্বেতরক্তকণিকা বাদ দেওয়া রক্ত' দিয়ে কাজ চালানো হয়। এছাড়া **এ রোগ এড়ানোর একটি অন্যতম উপায় হল খুব নিকট রক্ত-সম্পর্কিত মানুষ** (first degree relative)-এর রক্ত না দেওয়া।

❖ থ্যালাসেমিয়া বা হিমোফিলিয়া রোগীদের, বা গর্ভকাল পুরো করে যেসব শিশু জন্মায়, কেমোথেরাপি পাচ্ছে এমন প্রায় সমস্ত রোগী, অস্থিমজ্জা অকেজো হয়ে যাবার কারণে রক্তশূন্যতায় আক্রান্ত রোগী, এদের অন্য কোনও বিশেষ কারণ না থাকলে (অনাত্মীয়) গ্রহীতার রক্ত এমনি দেওয়া যায়, তাতে গামা-রশ্মি প্রয়োগ করার দরকার হয় না।

সবশেষে বলি, আমাদের প্রতিবেশি-আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব মহলে যখনই কোনও

কারণে কারও রক্তের প্রয়োজন হয়, আর রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাঁরা হা-হুতাশ করেন, সরকারি ব্লাড-ব্যাঙ্ককে গালি দেন, আর সংক্রমণের ভয় আছে জেনেও প্রাইভেট ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে চড়া দামে রক্ত কিনে প্রাণ বাঁচান, তখন বিভিন্ন সরকারী ব্লাড-ব্যাঙ্কে নানা অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও সেটাই আমার এই সঙ্কটের প্রধান কারণ বলে মনে হয় না। বরং একটা পুরনো গল্প আমার মনে পড়ে যায়। গল্পটা আপনারাও সবাই শুনেছেন—দুধপুকুরের গল্প। এক গ্রামের সবার মনে ইচ্ছে সেখানে একটা পুকুর হোক, এমনি পুকুর নয়, দুধপুকুর। শেষ পর্যন্ত জমিদারমশাই রাজি হলেন, দুধপুকুরের জন্য জমি কেটে গর্ত করে দিলেন, বাঁধিয়েও দিলেন, তবে এক শর্তে। গ্রামে তো অনেক মানুষ, এক শুভদিনের রাত্রিবেলায় তাঁদের প্রত্যেককে এক বালতি করে দুধ সেই দুধপুকুরের গর্তে ঢেলে দিতে হবে। সব গ্রামবাসী একপায়ে খাড়া, তাঁদের এতোদিনের সাধ বলে কথা! তো সেই শুভরাত্রি চলে গেল, জমিদারমশাই সকালে গিয়ে দেখলেন দুধপুকুর জলে ভরে আছে, দুধ নেই একফোঁটা। কী ব্যাপার? না, প্রত্যেক প্রজারই মনে হয়েছে, সবাই তো এক বালতি দুধ দেবে, আমি যদি এক বালতি জল নিয়ে যাই রাত্তিরবেলায় কেউ বুঝতেই পারবে না কী ঢেলে দিলাম।

রক্তদানের ক্ষেত্রেও এক ব্যাপার। যখন পাড়ায় রক্তদানের ব্যবস্থা হয়, আমরা অধিকাংশ ভাবি, দূর, কী হবে সূঁচ ফুটিয়ে ব্যথা নিয়ে, সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে। ফলে সরকারী ব্লাড-ব্যাঙ্কের ভাঁড়ার খালি পড়ে থাকে, বিশেষ করে গরমের সময়ে। আমরা যখন বিপদে পড়ি তখন বুঝি—সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। শুধু এই কথাগুলো বিপদ কেটে গেলে মনে রাখি না, এই যা দুঃখ।

লেখক পরিচিতি : ডা. সর্বাণী চট্টোপাধ্যায়, এমবিবিবিএস, ডিসিএইচ, ডিসিপি, এমডি, কলকাতার একটি সরকারী মেডিকেল কলেজে প্যাথোলজি বিভাগের অধ্যাপক।

কুইজ

এবারের কুইজটি তৈরি করেছেন **অভিষেক দাস**, পুনেতে একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র।

প্রশ্ন : ১। কিছু রোগের কারণে অনেক সময় অপারেশন করে প্লীহা (spleen) বাদ দিতে হয়। এই অপারেশনের অনেক বছর পরেও রক্তে কি পাওয়া যায় যা প্লীহা বাদ দেওয়ার নির্দশন?

২। টাইট হ্যান্ডকাফ পরলে কোন স্নায়ুতে চাপ লেগে সমস্যা (handcuff neuropathy) হতে পারে?

৩। শিশু বয়সে বিকিরণ লাভের (Radiation exposure) সঙ্গে কোন ক্যানসারের বিশেষ যোগ লক্ষ্য করা গেছে?

৪। এনডেমিক টাইফাস রোগটি মানুষে কোন প্রাণীর কামড় দ্বারা বাহিত হয়?

৫। ১৯৯৪ সালে প্রণীত ভ্রূণাবস্থায় গর্ভ-শনাক্তকরণ পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ও অপব্যবহার রোধকারী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

৬। নাকের দুটি নাসারন্ধ্রর মাঝখানে একটা দেয়াল আছে, তাকে Nasal Septum বলে। অনেকের এটি একদিকে বাঁকা থাকে। কোন ধরনের অপারেশন এটাকে ঠিক করার সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি?

৭। স্থানীয়ভাবে কাজ করার জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিক-জাতীয় ওষুধ চোখ ও কানের ফোঁটা হিসাবে খুব বেশি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কানের সংক্রমণের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারণ অনেক সময় তা শ্রবণযন্ত্রের ক্ষতি করে?

৮। দ্বিতীয় প্রজন্মের কোন অ্যালার্জির ওষুধ (যেমন সেট্রিজিন) বর্তমানে বহুল প্রচলিত। প্রথম প্রজন্মের অ্যালার্জির ওষুধের চেয়ে এদের মূল সুবিধা কী?

৯। নাকের পাশে কোন সাইনাসের ছবি মুখ খুলে বিশেষ ভাবে X-ray তুললে (open mouth water view X-ray) সবচেয়ে ভাল দেখা যায়?

১০। অশ্রুনালীতে কোনও বাধা থাকলে সবসময় অস্বাভাবিক ভাবে অশ্রু উপচে পড়ে — একে কি বলে?

১১। মহিলাদের জননতন্ত্রে কোন ধরনের স্খলন (Genital prolapse) সবচেয়ে বেশি দেখা যায়?

১২। শুধুমাত্র সঞ্চালক স্নায়ুর পক্ষাঘাত (pure motor paralysis) অর্থাৎ অনুভূতি ঠিক থাকে কিন্তু মাংসপেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়— সবচেয়ে বেশি কোন রোগে হয়?

১৩। কিছু অসুখে রোগীকে বাঁচাবার জন্য শ্বাসনালীতে ফুটো করে ট্র্যাকিয়োস্টমি নামক অপারেশন করতে হয়। যখন দীর্ঘদিন এভাবে রাখতে হয়, তখন ওই ফুটোতে কোন টিউব ব্যবহার করা হয়?

১৪। ভেন্টিলেটর যন্ত্রটি এখন অতিপরিচিত। এরই প্রাথমিক রূপ হার্ট-লাংস মেশিন প্রথম কে তৈরী করেন?

১৫। বয়স্ক লোকেদের 'পারকিনসন ডিজিজ' বিশ্বজুড়ে একটা বড় সমস্যা। বিশ্ব পারকিনসন দিবস কত তারিখে?

উত্তর ... ৪৩ পৃষ্ঠায়।

আপনার বাচ্চার অটিজম নেই তো?

অটিজম রোগটার প্রথম লক্ষণগুলো সন্দেহ করা তেমন শক্ত কিছু নয়, এবং যত তাড়াতাড়ি বাচ্চার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য ততই মঙ্গল। কিন্তু এ রোগ সন্দেহ করবেন কখন? বুঝিয়ে দিচ্ছেন **ডা. নীনা ঘোষ।**

ঋজুর এখন বয়স হল তিনবছর, রিষড়ায় মা-বাবা আর বছর আটেকের দিদির সঙ্গে থাকে। তিনবছর আগে যখন ছোট্ট ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান ঋজু জন্মাল তখন বাড়িতে আর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি আনন্দ! পাড়াপড়শি মাসি-পিসি-কাকিমা-জেঠিমার দল তাকে দল বেঁধে দেখতে এলেন— চাঁদের হাট বসে গেল।

যখন ঋজুর বছরখানেক বয়স, তখন ওর মা'র কেমন যেন চিন্তা হল—আরে, বাচ্চাটা কথা না বলুক, খানিক শব্দ তো করবে? কিন্তু ঋজু কলকল করে না, এমনকি প্রায় যেন হাসেও না। ঋজুর দিদির এমনি বয়সটা মায়ের মনে আছে— সে এরকম ছিল না তো! পাড়ার ডাক্তারের কাছে তিনি কথাটা পাড়লেন, কিন্তু ডাক্তারবাবু বললেন — ও তেমন কিছু নয়, সবাই কি আর সমান বয়সে কথা বলে? মা তখনকার মতো মেনে নিলেন, তবে বুকের মধ্যে একটা চাপা দুর্ভাবনা রয়েই গেল। তারপর তিনি দেখলেন ঋজুর সমবয়সী বাচ্চারা পাড়ার 'প্লে-স্কুল'-এ যেতে শুরু করল। ঋজুর আড়াই বছর হয়ে গেল, সে দিব্যি হাঁটে, দৌড়য়, এমনকি নিজে নিজে খেতেও পারে—কিন্তু কথা বলতে জানে না, আর সমবয়সীদের ব্যাপারে তার যেন কোনও উৎসাহই নেই। সুতরাং তিনি আবার দৌড়লেন ডাক্তারের কাছে। ''সে কী, আড়াই বছরে একটা কথাও বলছে না''—এবার ডাক্তারবাবু বেশ বিচলিত। ঋজুর মাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন তিনি, মনে দিয়ে শুনলেন তাঁর উত্তর, তারপর ঋজুকে পাঠালেন এক বিশেষজ্ঞের কাছে।

তারপর এ-ডাক্তার ও-ডাক্তারের চেম্বারে হাসপাতালে চলল ঘোরাঘুরি, যখন ঋজু সাড়ে তিন বছরে পড়ল, তখন সবাই একমত হলেন—ওর অটিজম (Autism) আছে। তার মা'বাবা শেষ ভরসা ভেঙে যাবার সেই দিনটা এখনো ভুলতে পারেন না।

কেন এটা হল?

আমার দোষে এটা হল না তো?

আমায় বাচ্চা কোনোদিন স্বাভাবিক হবে না?

প্রশ্নগুলো তাঁদের মাথায় হাতুড়ির মতো ঘা সারতে লাগল, যেমন অটিজম-আক্রান্ত সমস্ত বাচ্চার মা-বাবার মাথাতেই সারে। কিন্তু উত্তর?

অটিজম-এর সমস্যা

সত্যি কথাটা হল, অটিজম-এর গোড়ার কারণটা আমরা এখনও জানি না। আমরা জানি মেয়েদের

চাইতে ছেলেদের এ-সমস্যা বেশি হয়। আমরা জানি অটিজম বড় জটিল সমস্যা, আর মানুষের গোটা জীবনটা ধরে এ সমস্যা থাকে।

অটিজম-আক্রান্ত মানুষ অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারে না। কথার মাধ্যমে, হাবভাব-আচরণের মধ্যে অন্য মানুষের সঙ্গে যে মানসিক যোগাযোগ গড়ে তোলা —অটিজম-এ সেই ক্ষমতা কমবেশি লোপ পায়, ফলে সামাজিক আচরণবিধি মেনে চলা থেকে সামাজিকভাবে আর পাঁচজন সঙ্গে মেলামেশা-এসব 'অটিস্ট'-রা করতে পারে না। সে প্রায়শই একই কথা অর্থহীনভাবে বারবার বলতে থাকে, একই কাজ বিরক্তিকরভাবে বারবার করতে থাকে।

ফলে অটিজম-আক্রান্ত মানুষ সমাজের মধ্যে যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ; সে সমাজে যেতে পারে না, সমাজ তাকে টেনে নিতে পারে না। অথচ তাকে এই সমাজের মধ্যেই বাস করতে হয়—এটা শুধু তার একার পক্ষেই কষ্টকর অভিজ্ঞতা নয়, তার পরিবার, তার আশপাশের সমস্ত মানুষ, তার শিক্ষক-প্রত্যেকের কাছেই এটা কঠিন সমস্যা।

অথচ প্রথমদিকে এর লক্ষণগুলো অনেকসময় উড়িয়ে দেওয়া হয়, যেমনটি ঋজুর ডাক্তার করেছিলেন তার একবছর বয়সে।

অটিজম-এর লক্ষণ

কিন্তু একদম ছোটোবেলাতে অটিজম-এর কয়েকটি উপসর্গ ও লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, আর সেগুলো থেকেই ডাক্তার বা মা-বাবা অটিজম সন্দেহ করতে পারেন।

- যদি বাচ্চা ৬ মাস বয়সেও না হাসে।
- যদি ১২ মাস বয়সেও এলোমেলো শব্দ করা (দেয়ালা করা), আঙুল দিয়ে জিনিস দেখানো, বা নানা অঙ্গভঙ্গি করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা — এসব না করে।
- যদি ১৬ মাস বয়সেও বাচ্চা একটাও অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ না করে
- যদি ২৪ মাস বয়সেও দুটো শব্দ জুড়ে অর্থপূর্ণ কথা না বলে ('বাড়ি যাব', 'বেই-বেই যাব')।
- যদি আগে শেখা কিছু উন্নতি, শব্দ বা ভাববিনিময়ের ক্ষমতা তার লোপ পায়, বা এসব শেখা-জিনিস একেবারে ভুলে যায়।

প্রাথমিকভাবে মা-বাবাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তাঁদের বাচ্চা কি—

- নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয় (ঘাড় ঘুরিয়ে, হেসে, বা অন্যভাবে)?
- কিছু দরকার হলে সেটা চাইতে পারে (যেমন কোলে ওঠার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া)?
- অন্য বাচ্চার তুলনায় কথা দেরীতে বলছে?
- কিছু করতে বললে সেটা করতে পারে? (যেমন হাতছানি দিয়ে বেড়ানোর জন্য ডাকলে এগিয়ে আসা)
- কানে শুনতে পাচ্ছে না বলে মনে হয়?
- কিছু সময় কালে শোনে, আবার কোনো কোনো সময়ে যেন শুনতেই পায় না?

- আঙুল দিয়ে জিনিস দেখায় (যেমন গড়িয়ে-যাওয়া লাল বল), টা-টা করে হাত ঘোরায়?
- আগে কিছু কথা বলত কিন্তু সেগুলো আর বলছে না?
- ভয়ানক রেগে যায়?
- অদ্ভুত ভাবে নড়াচড়া করে, যেন একটা বিশেষ ধাঁচ (pattern) অনুসরণ করছে?
- তার দিকে হাসলে ফিরে হাসে না?
- খেলনা দিয়ে খেলতে জানে না?
- একলা থাকতে পছন্দ করে? মনে হয় তার আলাদা জগতে রয়েছে?
- কিছু কিছু জিনিসের প্রতি, বা কিছু রুটিন কাজের ধরনের প্রতি, অস্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর যত বেশি 'হ্যাঁ' হবে, তত বুঝতে হবে বাচ্চাটির মানসিক বৃদ্ধি ও অন্যদের সাথে সংযোগ গড়া বা ভাববিনিময়ে সমস্যা রয়েছে। তখন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে—অটিজম হতে পারে।

ভবিষ্যৎ কী?

অটিজম-আক্রান্ত বাচ্চা ও তার মা-বাবার বিশেজ্ঞর সাহায্য দরকার। বিশেষ প্রশিক্ষণে এইসব বাচ্চাদের ভাববিনিময় করার কায়দা অনেকটা শেখানো সম্ভব। অন্যদের সঙ্গে তারা মিশতে শেখে, খেলতে শেখে, এভাবেই 'সামাজিক' হতে শেখে, কথা বলতে অনেকটা শেখে। যত কম বয়সে অটিজম ধরা যায় ও ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তার উন্নতি তত বেশি হয়।

সুতরাং মা-বাবার যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় বাচ্চা অটিজম হলেও হতে পারে, সোজা চিকিৎসকের কাছে চলে যান। তিনি যদি ভালো করে না দেখেই সমস্যাটা উড়িয়ে দেন, তো অন্য কোনো শিশু-চিকিৎসক বা মনোরোগ-বিশেষজ্ঞের কাছে যান। আপনার সন্দেহ কেন হচ্ছে স্পষ্ট করে জানান। অবশ্য মনে রাখবেন আপনার সন্দেহ ভুলও হতে পারে, কিন্তু চিকিৎসক যেন পুরোটা দেখে -

ভেবে পরামর্শ দেন। ''আরে কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে দেখুন তো!'' এটা সবসময়ে সুপরামর্শ নয়, কেন না সত্যি অটিজম হলে যত তাড়াতাড়ি বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারা যায় ততই ভাল — আপনার বাচ্চা বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারবে, সে 'পুরো স্বাভাবিক' হোক আর না-ই হোক!

লেখক পরিচিতি : ডা. নীনা ঘোষ, এম বি বি এস, ডি সি এইচ, ডি এনবি, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, একটি বেসরকারি পোস্ট - গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক।

advt.

With Best Compliments from

Safe International

P-95, Kalindi Housing Estate,
Kolkata - 700089, WB, India,
Ph & Fax - (033) 25223051, 9831908000
Email: safeinternational@gmail.com

মনোযোগহীন অতি-চঞ্চল বাচ্চা

আপনার বাচ্চা খুব চঞ্চল? পড়ায় মন নেই? ভয়ানক জেদি, একগুঁয়ে? এখন যা ইচ্ছে তা-ই বলে, তা-ই করে? খারাপ কথা বলা শিখেছে? ফলাফল বিচার বোধ একেবারে নেই? তাকে বকাঝকা মারধোর না করে বরং নিয়ে যান মনের ডাক্তারের কাছে। ADHD হতে পারে; বাংলায় বললে বলা যায় "মনোযোগ-হীনতা অতি-চঞ্চলতা রোগ' — জানাচ্ছেন **মনোবিদ রুমঝুম ভট্টাচার্য।**

অনীক অতিরিক্ত চঞ্চল। সে পড়ায় মন দিতে পারছে না। সে জন্য তার স্কুলে রেজাল্ট খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার ছটফটানির চোটে বাড়ির লোকও অস্থির হয়ে পড়েছে। সে অতিরিক্ত কথা বলে। তার জেদও ভীষণ বেড়ে গেছে। সে খারাপ কথা বলা শিখেছে। ফলাফল বিচার না করে, যা মনে আসছে তাই বলছে বা করছে। অনীকের বাবা-মা তাকে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু এক খটমট রোগের নাম বললেন 'Attention Deficit Hyperactive Disorder' যাকে সংক্ষেপে বলা হয় ADHD। বাংলায় তেমন প্রতিশব্দ নেই, আমরা বলতে পারি ''মনোযোগ-হীনতা অতি-চঞ্চলতা রোগ''।

অনীকের বাবার মনে এই রোগ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জাগে। সম্প্রতিকালে অনীকের বাবার মতো অনেক মানুষ আছেন যাঁদের সন্তান অতিরিক্ত চঞ্চলতা, অমনোযোগিতা ও জেদ এই সব কারণে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ছে। তাঁদের মধ্যে কারো কারও বাচ্চাকে হয়তো ইতিমধ্যে ডাক্তার দেখানো হয়েছে। আবার কারো কারো বাচ্চার রোগ নির্ধারণের কাজটি শেষ হয়নি। এনাদের সবার মনেই নিশ্চয়ই ADHD সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসে। তাঁদের মনে তাঁদের বাচ্চার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক আশঙ্কা জেগে ওঠে। সেই সব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা মা-র কথা ভেবে ADHD সম্বন্ধে আজকের এই বিস্তারিত আলোচনা।

ADHD আসলে কি?

শিশুবয়সের বিভিন্ন অসুখের মধ্যে এটি একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য অসুখ। ছোটবেলার এই অসুখ বড় বয়স পর্যন্ত থাকতে পারে। এই রোগের প্রধান উপসর্গগুলো হল অমনোযোগিতা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা ও নিজের আচরণের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো।

ADHD তিনরকমের হতে পারে :

১। অতিরিক্ত চঞ্চলতা ও জেদ।
২। অমনোযোগিতা
৩। অতিরিক্ত চঞ্চলতা, জেদ ও অমনোযোগিতা।

অমনোযোগিতা, অতিরিক্ত চঞ্চলতা এবং জেদ এই তিনটি হল ADHD-র প্রধান লক্ষণ।

সাধারণভাবে এই তিনটি লক্ষণ বাচ্চাদের মধ্যে প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যখন তা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনই বাবা-মার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অবশ্যই এই লক্ষণগুলি ছ'মাসের বেশি সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে ও সমবয়সী বাচ্চাদের তুলনায় তার প্রাবল্য বেশি হতে হবে।

অমনোযোগিতার লক্ষণগুলি হল :

খুব সহজে মনঃসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া, খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে না পারা আর সহজেই এক কাজ থেকে অন্য কাজে মনোযোগ সরে যাওয়া। বাচ্চার পক্ষে কোন বিষয়ে এক ভাবে মনোযোগ স্থাপন করা অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে স্কুলের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রায়ই জিনিসপত্র স্কুলে হারিয়ে ফেলে। মনোযোগের অভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্দেশ অনুসরণ করা অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়।

অতিরিক্ত চঞ্চলতার লক্ষণগুলি হল :

এক জায়গায় বসা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সর্বক্ষণ কথা বলতে থাকে। চোখের সামনে যা দেখে তাই ছুঁয়ে দেখতে চায়। অর্থাৎ এক জায়গায় বসে থাকা বাচ্চার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়েও দাঁড়ায়।

অতিরিক্ত জেদের লক্ষণগুলি হল :

অধৈর্য হয়ে যাওয়া, যা মনে আসে তাই বলে ফেলা, নিজের ইমোশন প্রকাশ করার ক্ষেত্রে লজ্জা বোধ না থাকা, ফলাফলের চিন্তা না করে দুম করে কোন কাজ করে ফেলা। অন্য লোক কথা বলছে তার মধ্যে কথা বলা একটি লক্ষণ।

ADHD হয় কেন?

ADHD বিভিন্ন কারণে হতে পারে—জিন ঘটিত কারণে, পরিবেশের জন্য, পুষ্টিজনিত কারণে, মাথায় আঘাতজনিত কারণে বা সামাজিক কারণে।

অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে দেখা যায় জিন ঘটিত কারণে মস্তিষ্কের যে অংশ মনোযোগ-স্থাপনের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয় সেই অংশের টিস্যুগুলো অপেক্ষাকৃত পাতলা হয়। সেই কারণে তাদের অমনোযোগিতা বাড়ে। তবে এই শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় পরবর্তীকালে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের টিস্যুগুলো সাধারণ আকার ধারণ করে ও অমনোযোগিতার লক্ষণগুলো চলে যেতে থাকে। পরিবেশগত কারণগুলোর মধ্যে দেখা গেছে যে সব মা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ধূমপান করেন বা মাদকদ্রব্য নেন তাঁদের বাচ্চাদের এই অসুখ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

মাথায় আঘাত লাগলেও অনেক সময় বাচ্চাদের এই অসুখ হতে পারে। যদিও তার সম্ভাবনা অনেক কম।

ADHD সারে কি?

ADHD সম্পূর্ণভাবে সারা মুশকিল। তবে চিকিৎসার মাধ্যমে এই অবস্থার উন্নতি করা সম্ভব। ছোট বয়সে রোগ নির্ধারণ করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে তারা একটা পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

ADHD-র চিকিৎসা :

ওষুধের মাধ্যমে এই অসুখের চিকিৎসা করা হয়। তাছাড়া সাইকোথেরাপির মাধ্যমেও এই অসুখের চিকিৎসা সম্ভব।

লেখক পরিচিতি : রুমঝুম ভট্টাচার্য, মনোবিদ। কাজ করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে। এছাড়াও যুক্ত আছেন কর্পোরেট সেক্টরে।

টিবি: MDR তথা XDR টিবি

যক্ষ্মারোগের নানা ওষুধের আবিষ্কার ও তারপর একসাথে কয়েকটি ওষুধের সার্থক প্রয়োগ (মাল্টিড্রাগ থেরাপি) করে যক্ষ্মা তথা টিবি-কে খুব ভালোভাবে সারানো যাচ্ছিল। আশা করা হচ্ছিল শীঘ্রই যক্ষ্মামুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন সার্থক হবে। কিন্তু বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মার (MDR-TB, XDR-TB) উদ্ভব আমাদের নতুন করে ভাবাচ্ছে—লিখছেন **ডা. মতিলাল মুখোপাধ্যায়।**

সনাতন মন্ডল ২০ বছরের যুবক। অস্থিচর্মসার চেহারা, প্রায় দেড় বছর ধরে কাশি আর জ্বরে ভুগছে। প্রথমে প্রাইভেট ডাক্তার, তারপরে সামর্থ্যের অভাবে সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওষুধ খেয়েছে, কিন্তু এখনও তার কফে টিবির জীবাণু রয়ে গেছে। এটি একটি বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা MDR টিবির চিত্র। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্লেগের পরেই টিবি হল সবচেয়ে পুরনো রোগ। তবু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজও আমরা টিবিকে আয়ত্বে আনতে পারিনি। বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টিবি এক ভয়াবহ সমস্যা। তার ওপর MDR ও XDR টিবি হল গিয়ে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। তাই ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (WHO) বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা টিবিকে স্থান দিয়েছে ''as top priority over all the diseases''।

MDR টিবি- কি ও কেন?

টিবি চিকিৎসার প্রধান শর্ত হল সঠিক ওষুধ, সঠিক মাত্রায় সঠিক মেয়াদ পর্যন্ত খাওয়া। একজন রোগী যখন টিবিতে আক্রান্ত হন তখন তাঁকে ৫টি ওষুধের মধ্যে থেকে ৪টি বা ৫টিই বেছে নিয়ে সেইসব ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এই 'প্রথম শ্রেণীর ওষুধ'-গুলি হল স্ট্রেপ্টোমাইসিন ইঞ্জেকশন, আইসোনিয়াজিড ট্যাবলেট, ইথামবিউটল ট্যাবলেট, রিফামপিসিন ক্যাপসুল ও পাইরাজিনামাইড ট্যাবলেট; বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ট্যাবলেট ও ক্যাপসুলের বদলে সিরাপ চলতে পারে। এদের বলে প্রথম শ্রেণীর বা প্রথম ধাপের ওষুধ (First line anti-TB drugs)। সাধারণভাবে যদি আগে টিবি না হয়ে থাকে তাহলে ৪টি ওষুধ (ইঞ্জেকশন স্ট্রেপ্টোমাইসিন ছাড়া) আর যদি আগে টিবির ইতিহাস থাকে তাহলে ৫টি ওষুধই দিতে হবে। ওষুধের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে রোগীর ওজন অনুযায়ী। রোগের লক্ষণগুলো কমে গেলেও কিন্তু ওষুধগুলি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবশ্যই খেতে হবে। এর জন্য দরকার রোগ সম্পর্কে রোগী ও তার নিকটজনের সচেতনতা, রোগী ও ডাক্তারবাবুর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা। টিবি চিকিৎসার এই গাইডলাইনগুলি না মেনে চললে naturally resistant mutant জীবাণুগুলি (অর্থাৎ যেসব জীবাণু জেনেটিক মিউটেশানের ফলে এক বা একাধিক ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী হয়ে পড়েছে) মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ও প্রথম ধাপের ওষুধগুলি আর তখন কাজ করে না এবং সৃষ্টি হয় বহু ওষুধ প্রতিরোধী যক্ষ্মা বা MDR-TB (Multi drug resistant TB)।

সরকারী ব্যবস্থাপনায় DOT (Directly Observed Therapy) চিকিৎসা এমন একটি চিকিৎসা-ব্যবস্থা যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে দু-তিন মাস সপ্তাহে তিনদিন ওষুধ খেতে হয় ও বাকী চার-পাঁচ মাস সপ্তাহে একদিন গিয়ে ওষুধ আনতে হয়। অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ ছাড়া আর সব মানুষের কাছে DOT চিকিৎসা এখনও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া DOT চিকিৎসায় অসফল রোগী তথা MDR টিবির সংখ্যা এখন আর খুব কম নয়।

MDR টিবির সংজ্ঞা : একজন টিবি রোগীর ওষুধ চলাকালীন যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কফের টিবি জীবাণু দূর না হয়, ওষুধ দেওয়া সত্ত্বেও কফে টিবির জীবাণু থেকেই যায় তখন তাকে বলা হয় MDR suspect অর্থাৎ সন্দেহভাজন MDR টিবি। MDR ও XDR টিবি আসলে ল্যাবরেটরি ডায়গনসিস। বুকের এক্স-রে করে, বা সাধারণত আমরা যেভাবে কফ পরীক্ষা করাই (Sputum smear) তা করে, সেটা দিয়ে MDR-TB ডায়গনসিস করা যায় না। এর জন্য দরকার উন্নতমানের ল্যাবরেটরিতে কফের কালচার ও ড্রাগ সেনসিটিভিটি পরীক্ষা (DST)। যদি দেখা যায় টিবির জীবাণু আইসোনিয়াজিড ও রিফামপিসিন প্রতিরোধী তাহলে সেটা হল MDR টিবি আর আইসোনিয়াজিড ও রিফামপিসিনের সঙ্গে যদি সেই টিবি জীবাণু দ্বিতীয় ধাপের ওষুধগুলির (যে ওষুধগুলি MDR-TB চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হয়), তার মধ্যে আরও দুটি ওষুধে প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে তবে তা হল XDR-TB। দ্বিতীয় ধাপের ওষুধগুলি হল মূলত Ciprofloxacin / Ofloxacin / Levofloxacin / Moxifloxacin এবং Inj Kanamycin / Amikacin / Capreomycin। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। কোন কোন চিকিৎসক শুধুমাত্র MDR-TB সন্দেহ করে উপযুক্ত পরীক্ষা ছাড়াই একটার পর একটা দ্বিতীয় ধাপের ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন। এঁরা একসঙ্গে দ্বিতীয় ধাপের অনেকগুলো ওষুধ ব্যবহারও করেন না। শুধুমাত্র MDR-TB সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত পরীক্ষা ছাড়া দ্বিতীয় ধাপের ওষুধ প্রেসক্রিপশন করা ভুল; MDR-TB চিকিৎসা হিসেবে একটিমাত্র দ্বিতীয় ধাপের ওষুধ প্রেসক্রিপশন করা আরেক ভুল। এ-দুটোই টিবি চিকিৎসানীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এর ফলে একটার পর একটা দ্বিতীয় ধাপের ওষুধে প্রতিরোধ তৈরী হতে থাকে ও সৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর TDR বা Pan drug resistant টিবি।

এটা বলা বাহুল্য যে MDR টিবি ডায়গনসিস, অর্থাৎ রোগনির্ণয়, বেশ খরচ ও সময় সাপেক্ষ। এর জন্য ড্রাগ সেনসিটিভিটি পরীক্ষা (DST) করা আবশ্যক। একটা ড্রাগ সেনসিটিভিটি পরীক্ষা (DST)

তে সময় লাগে প্রায় ২-৩ মাস ও খরচ প্রায় ৮-১০ হাজার টাকা। আজকাল অবশ্য আইসোনিয়াজাইড ও রিফামপিসিন প্রতিরোধ 'জিন ডিটেকশন, (gene detection)-এর সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে, মাত্র একদিনে MDR-TB ডায়গনসিস সম্ভব (Sputum for Hyne's test)।

গুরুত্ব : সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে MDR টিবির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসঙ্গত, টিবি রোগীদের মধ্যে যাঁদের এর আগে একবার দুবার টিবির ইতিহাস আছে, তাঁদের মধ্যে প্রায় ১১-১৭ শতাংশ MDR টিবি। MDR টিবির চিকিৎসার জন্য যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার হয় সেগুলো ভীষণ দামী। দীর্ঘদিন চিকিৎসার জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার (ভর্তি না করেও রোগী পিছু প্রায় ২ লক্ষ টাকা) তা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য। এই সমস্ত রোগীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এত অসুস্থ থাকেন যে তাঁদের পক্ষে রোজগার চালিয়ে যাওয়াও অসম্ভব, ফলে গোটা পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। পরিবারের মধ্যে একই সঙ্গে থাকার মস্ত ঝুঁকি হল পরিবারের অন্যজনের মধ্যে সংক্রমণ। এর ফলে একই পরিবারে অনেক সময় একাধিক MDR রোগী দেখা যায়। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে সরকারের ভূমিকার। অতি সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র কয়েকটি জেলায় 'DOT Plus' চিকিৎসা শুরু হয়েছে, সুতরাং এখনই এর সফলতা সম্পর্কে বলা মুশকিল, এবং প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। মনে হয় বিশেষ সামাজিক সুরক্ষাবীমা ছাড়া এর মোকাবিলা করা প্রায় অসম্ভব।

চিকিৎসা : MDR টিবির চিকিৎসা বেশ সহজ নয়, তবে প্রাথমিক কতকগুলি শর্ত পূরণ করলে ফল মেলে ভাল। এই শর্তগুলি হল—

- প্রাথমিকভাবে যিনি চিকিৎসার দায়িত্বে থাকবেন, তাঁকে MDR টিবি ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হতে হবে।
- হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করলে সব থেকে ভাল, তার কারণ হল এই ওষুধগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মোকাবিলা করার জন্য প্রায়ই অন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্যের দরকার হয়।
- প্রত্যেকদিন ঠিকমত ওষুধ খাওয়া এবং নিয়মিত রোগীর ওপর নজরদারি।
- অর্থনৈতিক ও মানসিক সাপোর্ট।

চিকিৎসার বিশদ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। সে সমস্ত ওষুধগুলো দিয়ে সাধারণত চিকিৎসা হয় সেগুলো হল Inj Kanamycin / Amikacin, Quinolones (Ofloxacin / Levofloxacin / Moxifloxacin), Cycloserine, Ethionamide, PAS, ও 1st line drugs থেকে Ethambutol ও Pyrazinamide। কফের রিপোর্ট নেগেটিভ হবার পর আরও ২ বছর পর্যন্ত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে (ইঞ্জেকশন ছাড়া)। এই দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল চিকিৎসায় প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ রোগী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যান, অবশ্যই যদি উপরিলিখিত শর্তগুলি মেনে চলা যায়।

প্রতিকার : 'MDR-TB is a man made problem', সুতরাং এর চিকিৎসা করার চেয়ে বরঞ্চ MDR টিবি যাতে না হয় তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। চিকিৎসা যেখানেই হোক না কেন, প্রাইভেট ডাক্তার অথবা DOTS, সঠিক ওষুধ, সঠিক মাত্রায় সঠিক মেয়াদ পর্যন্ত খেলে টিবি সেরে যাবে ও MDR টিবি হবে না। এই সচেতনতা শুধু সাধারণ মানুষের জন্যই নয়; চিকিৎসকদেরও আরও দায়িত্বশীল হতে হবে ও গাইডলাইন মেনে চিকিৎসা করতে হবে। তবেই একদিন যক্ষ্মা-মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন সার্থক হবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. মতিলাল মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এমডি, বক্ষরোগবিশেষজ্ঞ। একটি হাসপাতালে বক্ষরোগ বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র।

ভোজ্যতেল নির্বাচন : কোন রান্নার তেল ব্যবহার করবেন?

গরু ছাগলে যা খায়, কুকুর বেড়ালে তা খায় না, আবার আমাদের বাঙালিদের খাবারের থেকে জাপানিদের খাবারের পছন্দে বিস্তর ফারাক। কী খাব এই চিরন্তন প্রশ্ন স্বাস্থ্যসচেতন মানুষকে ভাবিয়ে বেড়াচ্ছে যেদিন থেকে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, ইউরিক অ্যাসিড বৃদ্ধির মত রোগের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে —লিখছেন ***ডা. গৌতম মিস্ত্রি।***

কী খাওয়া উচিত — মনুষ্যেতর প্রাণীদের এই কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় না। প্রকৃতির এই বিশাল আর বৈচিত্র্যময় জীবজগতের মধ্যে কেবল মানুষেরই কেন আলাদা করে জেনে নিতে হয় কী খেলে সে ভালো থাকবে? মানুষের এই না জানা প্রশ্নের দুটো কারণ আছে। প্রথমত একমাত্র মানুষই বিভিন্ন কারণে তার খাবারের অভ্যাস আদিম পূর্বসুরীদের থেকে পাল্টে ফেলেছে, যেটা প্রথমের দিকে সুবিধাজনক হলেও ক্রমশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানে জানা যাচ্ছে খাদ্যাভ্যাস পাল্টাতে পারলে আরও বেশিদিন সুস্থভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব। সুখাদ্য নির্বাচনের পথ বহুমুখী, কিন্তু মূলসূত্র এক। অসাধু ব্যবসায়ীদের টেলিভিশন ও ছাপা-মাধ্যমে পয়সা খরচ করে দেওয়া বিজ্ঞাপন ও অপপ্রচারের ভিড়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। এর কুফল খুঁজতে পুঁথি ঘাঁটতে হবে না। স্বল্পশিক্ষিত তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অনিরাময়যোগ্য স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, সেরিব্রাল স্ট্রোক ও কিডনির অসুখই এর বড় নিদর্শন। সুখাদ্য নির্বাচন সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন উপভোগ করতে পারার অন্যান্য শর্তের মধ্যে একটি। আবার সুখাদ্য নির্বাচনেরও বেশ কয়েকটা মূলসূত্র আছে। এরই মধ্যে ভোজ্যতেলের বিষয়টি বহুবিতর্কিত, কিন্তু জেনে নেওয়াটা জরুরি। **(এই প্রবন্ধে ভোজ্যতেল, স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ফ্যাট মূলগতভাবে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।)**

খাবারে তেলের প্রয়োজনীয়তা কী?

ভোজ্যতেল খাবারের স্বাদ বাড়ায়, আবার শক্তি বা ক্যালরি যোগানের দিক দিয়ে অন্য ধরনের খাদ্যের (শর্করা বা প্রোটিন) চেয়ে বেশি শক্তিশালী। জীবকোষের আবরণ (cell wall), স্নায়ুতন্ত্রসহ আমাদের শরীরের বেশ কিছু উপাদান গঠনের জন্য তেল বা স্নেহজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। ''এ'', ''ডি'', ''ই'' এবং ''কে'' জাতীয় ভিটামিন কেবল স্নেহজাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ, আমাদের খাবারে ভোজ্যতেলের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কেবলমাত্র আপন রুচি ও রসনার উপরে এর উৎস ও পরিমাণ ছেড়ে দিলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে। কী ধরনের ভোজ্যতেল

স্বাস্থ্যকর ও দৈনিক কতটা খাওয়া উচিত এই আলোচনার আগে গুটিকয় সরল বৈজ্ঞানিক তথ্য জেনে নেওয়া যাক।

শক্তির উৎস বিভিন্ন খাবার :

আমরা যা খাই সেগুলোকে মূলত তিনটি প্রাথমিক ভাগে ভাগ করা যায়। প্রধান ভাগ (Staple food) হল শর্করা জাতীয় খাবার (carbohydrate) ভাত, রুটি, চিঁড়ে, মুড়ি, সুজি, নুডল্‌স ইত্যাদি মূলত শর্করা জাতীয় খাবার। ক্যালরির মাপে এই জাতীয় খাবারের পরিমাণ মোট খাবারের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ হওয়া উচিত। প্রোটিন বা দ্বিতীয় ধরনের খাবার আমাদের মাংসপেশী তৈরি, দেহের বৃদ্ধি আর ক্ষয়পূরণ করে। জীবকোষের স্তরে শারীরবৃত্তীয় অসংখ্য ক্রিয়াকলাপ যে উৎসেচক, হরমোন ও স্নায়ুর মাধ্যমে সংঘটিত হয় সেখানে রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ প্রোটিনের সাহায্যে ঘটে। প্রোটিন আবার আমিষ অথবা নিরামিষ খাবার থেকে পাওয়া যেতে পারে, আর এর পরিমাণ ক্যালোরির মাপে মোট খাবারের শতকরা ১৫ শতাংশ হওয়া উচিত। ডিম, মাছ, মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার আমিষ জাতীয় খাবারের প্রোটিনের প্রধান উৎস। নিরামিষভোজীরা প্রোটিন পেতে পারে ডাল জাতীয় খাবার থেকে।

স্নেহ-জাতীয় খাদ্য বা ভোজ্যতেল, যার পরিমাণ ক্যালোরির মাপে মোট খাবারের শতকরা ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে রাখা উচিত। পরবর্তী বিশদ আলোচনা এই স্নেহ-জাতীয় খাবারের পরিমাণ ও উৎসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবো।

খাবার মাপুন ক্যালোরির হিসাবে:

এক কিলো চালের ভাত আর এক কিলো তরমুজ ওজনে এক হলেও দুটোর মধ্যে ফারাক বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঐ পরিমাণের তরমুজ একজনে খেতে পারলেও এক কিলো চালের ভাত খাওয়া মুশকিল। আবার অপর দিকে সমপরিমাণের ভাতের তুলনায় সমপরিমাণের তরমুজে ঠিক সমান শক্তি পাওয়া যায় না। আমরা যা খাই সেটা তিন ধরনের কাজে লাগে। প্রথমত খাবার তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়। দ্বিতীয়ত অব্যবহৃত খাবার সঞ্চিত থাকে, পরে অভুক্ত অবস্থায় শক্তি সরবরাহের জন্য। তৃতীয়ত খাবারের এক অংশ শৈশবে ও কৈশোরে দেহের বৃদ্ধির রসদ জোগায় আর সমস্ত বয়সেই দেহের ক্ষয়পূরণ করে। খাবারের যে অংশটা এই সমস্ত শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগে সেটা আবার দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। খাদ্যবস্তুর বিশেষত্ব ও ভক্ষকের ক্ষমতা অনুযায়ী খাবারের কিছুটা অংশ শরীর ধরে রাখতে পারে না, মলের সঙ্গে বেড়িয়ে যায়। যে অংশটা শরীরে থেকে যায় সেটাকে খাদ্যের বায়ো-এভেলিবিটি বলব। শরীরে থেকে যাওয়া খাবারের ধরন (শর্করা, প্রোটিন অথবা স্নেহ জাতীয়) অনুযায়ী তার থেকে উৎপন্ন শক্তিও বিভিন্ন

পরিমাপের। ক্যালোরি হল এই শক্তি মাপার মাপকাঠি বা একক। এক গ্রাম গ্লুকোজ (শর্করা) অথবা এক গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ ক্যালোরি (১ ফুড ক্যালোরি = ১ কিলোক্যালোরি) শক্তি পাওয়া যায়, আবার এক গ্রাম স্নেহ-জাতীয় খাবার থেকে পাওয়া যায় ৯ ক্যালোরি। অর্থাৎ ওজনের নিরিখে শর্করা বা প্রোটিন জাতীয় খাবারের তুলনায় স্নেহ-জাতীয় খাবারে থেকে দ্বিগুণ শক্তি পাওয়া যায়।

প্রকৃতিগত ভাবে, আমাদের খিদের মাত্রাই সঠিকভাবে খাবারের পরিমাণটা শরীরের প্রয়োজনীয় অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করার কথা। কিন্তু সে খাবার মোটেই আধুনিক যুগের শক্তিঘন (energy-dense) খাবার নয়। আধুনিক যুগের খাবার অনেকাংশে প্রক্রিয়াকৃত (processed), পরিশোধিত (refined) ও শক্তিতে (ক্যালোরিতে) ভরপুর। এ খাবারের জন্য চাই স্ব-আরোপিত লাগাম। লাগাম তার পরিমাণে ও খাবার নির্বাচনে। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, বৃহদর্থে জীবনশৈলী পঞ্চাশ বছরের আগেকার মতো হলে এই প্রবন্ধ অবান্তর হয়ে পড়ত। যাই হোক, সুখাদ্য নির্বাচনের জন্য আমাদের দু'টো তথ্য জানতে হবে। কতটা খাব আর কী খাব?

কতটা খাবো?

স্থূলতায় না ভোগা একজন পূর্ণবয়স্ক লোক, যাকে কিনা রোজগারের জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হয় না, ক্যালোরির মাপে তার দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ১২০০ থেকে ১৬০০ ক্যালোরি। স্থূল হলে দেহের ওজন কমানোর জন্য দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ থেকে ৪০০ ক্যালোরি বাদ দিন। কোন ধরনের খাবার থেকে কতটা ক্যালোরি পাওয়া যাবে তার তালিকা পাওয়া যায়।

কী খাব ?

খাদ্যে তিনটি মৌলিক উপাদান থাকবে এমনভাবে যাতে খাদ্যের মোট ক্যালোরির ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ শর্করা জাতীয়, ১৫ থেকে ২০ শতাংশ প্রোটিন জাতীয় ও ৩০ শতাংশ স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া সুষম খাদ্যে থাকতে হবে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক উৎস থেকে আহরণ করা ভিটামিন, ক্যালোরিবিহীন ফাইবার (শাক ও রঙ্গিন সবজি) ও মিনারেল। শর্করা ও প্রোটিন জাতীয় খাবারের প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে বাদ দিচ্ছি। ভোজ্যতেল বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য উপাদানের আলোচনায় আসা যাক।

ভোজ্যতেল :

আলু পটল কেনা সহজ। কিন্তু সব কিছু বুঝেশুনে রান্নার তেল কেনার মত কঠিন কাজ আর হয় না। কোনও ডিপার্টমেন্টোল স্টোরে যান, থরে থরে বিভিন্ন রকমের রান্নার তেল সাজানো আছে। দুর্বোধ্য শব্দে তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে লেবেল সাঁটা আছে। স্যাচুরেটেড ফ্যাট, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, রিফাইন্ড তেল, ডাবল রিফাইন্ড তেল, বনস্পতি ইত্যাদি। এছাড়া আছে তেলের হরেক রকম উৎস— সূর্যমুখী তেল, রাইস ব্র্যান তেল, রেপসীড তেল, পাম অয়েল, বিশুদ্ধ ঘি, মায় বাঙালির প্রিয় সরিষার তেল। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক সমঝদার লোকও হতবুদ্ধি হয়ে যাবেন।

ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত ও সম্মানীয় এক চিকিৎসাবিষয়ক সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলাম। মুখোমুখি দুটো পাতা জুড়ে দুটো ভিন্ন রান্নার তেলের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। একটা সূর্যমুখী তেলের আর অন্যটা চালের তুষের (রাইস ব্র্যান) তেলের। দুটোতেই হৃদয়ের সুরক্ষা আর কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের দাবী করা হয়েছে। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন রকমের রান্নার তেলে ভাজা অতিরিক্ত হাল্কা ফুলকো লুচির ছবি সাথে সুস্বাস্থ্যের নিবিড় সম্পর্কের কথা শুনেছেন বহুবার। আকাশছোঁওয়া দাম বলে অমৃতসমান (!) জলপাই তেলের স্বপ্নও হয়তো দেখেছেন। চোখে জল আনা আসল সরিষার তেলের কথাতো ছেড়েই দিলাম। এইসব পরস্পরবিরোধী অথবা সামঞ্জস্যবিহীন দাবিদারদের মধ্য থেকে সঠিক তেল বেছে নেওয়াটা সহজ নয়। এর চেয়ে সহজ তেলের রসায়ন-বিজ্ঞান আর শারীরবিদ্যার প্রাথমিক পাঠ। ধৈর্য্য ধরে কয়েকটি মূলসূত্র বুঝে নিতে পারলে স্বাস্থ্যসম্মত তেল নির্বাচন ও তার সঠিক ব্যবহার সহজ হবে।

কতটা ফ্যাট খাবেন?

আমেরিকার ন্যাশানাল কোলেস্টেরল এডুকেশন (NCEP) প্রোগ্রামের ২০০১ সালের প্রমাণনির্ভর নির্দেশিকা অনুযায়ী দৈনিক ভোজ্যতেল সমেত সম্মিলিত স্নেহজাতীয় খাদ্য ক্যালোরির মাপে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছে। যেহেতু এক গ্রাম স্নেহজাতীয় খাদ্য ৯ কিলোক্যালরি শক্তি দেয় আর একজন পূর্ণবয়স্ক ভারতবাসীর দৈনিক মোট খাবারের প্রয়োজন ১২০০ থেকে ১৬০০ কিলোক্যালরি, আমাদের দৈনিক ভোজ্যতেল প্রয়োজন ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম। বিভিন্ন রকমের নামধারী কেতাদুরস্ত খাদ্যতালিকায় ভোজ্যতেলের মাত্রার তারতম্য লক্ষ্যণীয়। এটকিনস ডায়েটের (Atkins diet) খাদ্যতালিকায় অধিক পরিমাণে আমিষজাতীয় প্রোটিন বা মাংস থাকে। প্রোটিন বা মাংস সমৃদ্ধ খাদ্য পাকস্থলীতে অধিক সময় ধরে থাকে বলে তুলনামূলকভাবে অল্প খেলেই পেট ভরে যায় আর খুব শীঘ্র খিদেও পায় না। এই জন্য এই খাদ্যতালিকা মোটাদের রোগা হবার লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, মাংসের মধ্যে প্রচুর ফ্যাট থাকে আর সেই ফ্যাট কোলেস্টেরলপূর্ণ। হিসেব করে দেখা গেছে এটকিনস ডায়েটে তেল ৪০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবারের আড়ালে এটকিনস ডায়েট আসলে কোলেস্টেরল

ও ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার। ন্যাশানাল কোলেস্টেরল এডুকেশন প্রোগ্রামের প্রমাণ-নির্ভর তথ্য অনুযায়ী দৈনিক ৬৫ গ্রামের বেশি ফ্যাট গ্রহণে হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা দ্বিগুণ বেড়ে যায়।

সুতরাং, খাদ্যতালিকায় তেল কমানোর প্রয়োজনে মাংস যথেচ্ছ বাড়িয়ে দিলে বিপদ। এই দুটোতে রাশ টানলে বাকি রইলো শর্করা জাতীয় খাবার। অর্থাৎ খাদ্যতালিকায় তেলের মাত্রা অনেক কম করলে সেটা শর্করা জাতীয় খাবার সমৃদ্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু দেখা গেছে শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্যে রক্তে ক্ষতিকারক ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে যায় আর হৃদরোগ প্রতিরোধকারী হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা কমে যায়। অন্য বিপদও আছে। পেট ভরানোর জন্য প্রোটিন বা মাংস-সমৃদ্ধ খাবারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে শর্করা-সমৃদ্ধ খাবারের প্রয়োজন হয়, আর তাড়াতাড়ি আবার খিদেও পেয়ে যায়। শর্করা-সমৃদ্ধ যে খাবার যত বিশুদ্ধ (refined) তার থেকে গ্লুকোজ তত তাড়াতাড়ি রক্তে মেশে (high

glycemic index) আর তত তাড়াতাড়ি পাকস্থলী খালি হয়ে যায় ও আবার খিদে পায়। এর জন্য অরনিশ খাদ্যতালিকা (Ornish diet) যাতে তেলের মাপ ১০ শতাংশের কম, স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সর্বোপরি আমাদের শরীরে স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজন আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই ফ্যাট চাই সুষম পরিমাণে ও সঠিক বেশে। এই খাদ্যতালিকাকে বলব প্রুডেন্ট ডায়েট (Prudent diet)।

ফ্যাট, তুমি এসো সঠিক বেশে : ভালো তেল ও খারাপ তেল

ভালো ও খারাপ তেলের বৈশিষ্ট্য বোঝার আগে কোলেস্টেরলকে জানা চাই। আমাদের রক্তে ও শরীরের কোষের মধ্যে কোলেস্টেরল নামে এক ধরনের ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ থাকে যা বহু শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয়। কোলেস্টেরলের প্রধান দুটো শ্রেণীবিভাগ আছে—লঘুঘনত্বের (লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা এল ডি এল কোলেস্টেরল) ও গুরুঘনত্বের (হাই ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন বা এইচ ডি এল কোলেস্টেরল)। লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরলকে খারাপ কোলেস্টেরল বলে— রক্তে এই ধরনের ফ্যাট নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে গেলে সেটা উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের অন্যতম কারণ হয়। অপর দিকে গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলকে ভাল কোলেস্টেরল বলে, যেহেতু এর মাত্রা যত বেশি হয় তত হৃদয় ও রক্তনালী সুরক্ষিত থাকে। মনে রাখতে হবে, যদিও ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, মাংস, মেটে (লিভার) ইত্যাদি বিভিন্ন আমিষজাতীয় খাদ্যে কোলেস্টেরল থাকে, আমাদের শরীরের কোলেস্টেরলের মুখ্যভাগ (প্রায় ৯০ শতাংশ) ভোজ্যতেল থেকে শরীরের মধ্যেই তৈরি হয়। অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই অনুকূল কোলেস্টেরলের অনুপাত, আর সেই লক্ষ্যে চাই সঠিক ভোজ্যতেল নির্বাচন ও সঠিক রন্ধনপ্রক্রিয়া। রান্নার তেল নির্বাচন করার সময় আমাদের তেলের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো তেলের লেবেলে লেখা থাকার কথা। না থাকলে অন্য সূত্র থেকে জেনে নিতে হবে।

বৈশিষ্ট্য ১ : স্যাচুরেটেড ফ্যাট

স্নেহজাতীয় খাবারের বা তেলের মূল উপাদান হল কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু। সম্পৃক্ত তেলের (স্যাচুরেটেড ফ্যাট) কার্বন পরমাণু সম্পূর্ণভাবে হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে সম্পৃক্ত অর্থাৎ তার আর হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে না। অসম্পৃক্ত তেলের (আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, মনো-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট অথবা পলি-আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট) কার্বন পরমাণুতে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে। আমাদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপে অসম্পৃক্ত তেল সহজে হজম হয়। বাজারে যত রকমের ভোজ্যতেল ও অন্যান্য স্নেহজাতীয় খাবার পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন অনুপাতে এই দুই ধরনের তেলের মিশ্রণ থাকে। ২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organisation) ও আমেরিকার খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার (Food and Agriculture Organisation) সম্মিলিত রিপোর্টে মাত্রাতিরিক্ত সম্পৃক্ত তেল গ্রহণকে সরাসরি হৃদরোগের অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা এর ফলে 'লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল' বা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ২০০৪ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ডা. জার্মান ও সুইজারল্যান্ডের নেসলে গবেষণাগারের ডা. দিশার্ড বিস্তর পড়াশোনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে মানুষের স্বাস্থ্যকর খাবারে সম্পৃক্ত তেলের কোন ন্যূনতম সীমা

নির্ধারিত হয়নি। সম্পৃক্ত তেল যত কম খাওয়া যায় ততই ভালো। উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোক ছাড়াও আরও বিপদ আছে। অতিরিক্ত সম্পৃক্ত তেলের ব্যবহারে স্তন, মলাশয়, ওভারি ও প্রস্টেটের ক্যান্সার বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালের এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, বেশি সম্পৃক্ত তেলের ব্যবহারে হাড়ের উপাদান ক্যালসিয়াম কমে যায়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অভিমত যে ভবিষ্যতের সুস্বাস্থ্যের জন্য খাবারে সম্পৃক্ত তেলের পরিমাণ ক্যালোরির মাপে ৭ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকা উচিত। জাপানিদের খাদ্যে সম্পৃক্ত তেলের অনুপাত সবচেয়ে কম (৬ শতাংশ) আর সেই কারণে জাপানিদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ও হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবও বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম।

সারণি ১ : সম্পৃক্ত তেল বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটের উৎস

মাংস	ভেড়ার মাংস, গোমাংস, শুকরের মাংস, বেকন, সসেজ, মুরগির ডানা, মুরগির লেগপিস*, চামড়াযুক্ত মুরগির মাংস, যে কোন মাংসের রিবের অংশ
দুগ্ধজাত খাবার	মাখন না তোলা (>১%) দুধ, মাখন, ঘি, আইসক্রিম
কিছু ভোজ্যতেল	নারিকেল তেল, পাম তেল
বনস্পতিতে ও ঘি-এ ভাজা খাবার	প্রায় সবরকম বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত স্ন্যাক্স, বিস্কুট, কুকিজ, কেক

*১০০ গ্রাম ওজনের মুরগির লেগপিসে মোট ফ্যাট ও স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫ ও ৪.১ গ্রাম ও বুকের অংশে মোট ফ্যাট ও স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণ যথাক্রমে ৮.২ ও ২.৩ গ্রাম।

বৈশিষ্ট্য ২ : মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (ওমেগা ৯ ফ্যাট, ওলেইক অ্যাসিড)

এই ধরনের ফ্যাট খুব উপকারী। এটা রক্তের লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরেল মাত্রা কমায় আর গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরেল মাত্রা বাড়ায়। বিশেষজ্ঞরা দৈনিক খাবারের প্রয়োজনের এক-পঞ্চমাংশ বা ২২ গ্রাম মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণের পরামর্শ দেয়। যেহেতু ভারতবাসীদের রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা অপেক্ষাকৃতভাবে

বেশি, আর এই ধরনের ফ্যাট ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়ায় না, আমাদের ভোজ্যতেলে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বেশি হওয়া বাঞ্চনীয়। জলপাইয়ের (অলিভ) তেল, ক্যানোলা তেল, সরিষার তেল, অ্যালমন্ড, কাজুবাদাম, চিনেবাদাম মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটের প্রচলিত উৎস।

বৈশিষ্ট্য ৩ : পলিআনস্যাচুরেটেড

এই দ্বিতীয় ধরনের অসম্পৃক্ত তেলের আবার দুইটি শ্রেণীবিভাগ আছে— ওমেগা ৬ ও ওমেগা ৩ ফ্যাট।

ওমেগা ৬ (লিনোলেইক অ্যাসিড) : ঘরোয়া তাপমাত্রায় তরল থাকা এই ফ্যাট ক্যালোরির মাপে ১০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কারণ খারাপ লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল কমানোর সাথে সাথে এটা ভালো অধিকঘনত্বের কোলেস্টেরলও কমিয়ে দেয়।

ওমেগা ৩ : ওমেগা ৬-এর চেয়ে ওমেগা ৩ ফ্যাটের প্রয়োজনীয়তা বেশি, কারণ এটা ভালো অধিকঘনত্বের কোলেস্টেরল না কমিয়ে খারাপ লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল কমায়। গবেষণা করে দেখা গেছে ওমেগা ৩ ফ্যাট এছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ওমেগা ৩ ফ্যাট প্রদাহ (inflammation) কমায় ও হৃদরোগসহ অনেক দীর্ঘস্থায়ী অনিরাময়যোগ্য রোগ, ক্যান্সার, আরথ্রাইটিস প্রতিরোধ করে। মস্তিষ্কের স্মৃতিধারণ ও কর্মসম্পাদন ক্ষমতা গঠন ও সামগ্রিকভাবে মানসিক কর্মক্ষমতায় ওমেগা ৩ ফ্যাটের বিশেষ ভূমিকা প্রমাণিত।

ভিটামিন জাতীয় পদার্থের মত ওমেগা ৩ ফ্যাট শরীরে তৈরি হয়না, খাবারের মাধ্যমে সরাসরি গ্রহণ করতে হয়। মাছ ওমেগা ৩ ফ্যাটের প্রধান উৎস। তবে মনে রাখতে হবে, মাছ ভাজলে তাতে আর ওমেগা ৩ ফ্যাট পাওয়া যাবে না। অভ্যাস করতে পারলে তাজা ও কাঁচা মাছ খাওয়া সবথেকে উপকারী, তবে না ভেজে সিদ্ধ ধরনের রান্না করলেও ওমেগা ৩ ফ্যাট পাওয়া যাবে। নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সপ্তাহে ৩ থেকে ৪ বেলা না-ভাজা মাছ গ্রহণে যে ওমেগা ৩ ফ্যাট পাওয়া যায় তাতে ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ হঠাৎ মৃত্যুর (হৃদরোগ ও অন্য কারণে) সম্ভাবনা কমে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত খাদ্য তালিকায় ওমেগা ৩ ফ্যাটের চেয়ে ওমেগা ৬ ফ্যাট পরিমাণে বেশি দেখা যায়। সুষম খাদ্যতালিকায় ২:১ থেকে ৪:১ অনুপাতে ওমেগা ৬ ও ওমেগা ৩ ফ্যাট থাকলে ভাল। প্রতি ৪ গ্রাম ওমেগা ৬ ফ্যাটের সাথে ১ গ্রাম ওমেগা ৩ ফ্যাট গ্রহণ করা স্বাস্থ্যকর। নিরামিষাশি ভারতীয়দের খাবারে হৃদরোগ-নিবারণকারী ওমেগা ৩ ফ্যাটের পরিমাণ কম।

যদিও সব ধরনের মাছেই ওমেগা ৩ ফ্যাট আছে, সাধারণত তৈলাক্ত মাছ, যেমন স্যামন (Salmon), ম্যাকারেল (Mackerel), সারডিন (Sardines), হেরিং (Herring), টুনা (Tuna)— এই সব মাছে বেশি পরিমাণে এই ফ্যাট পাওয়া যায়। এদেশে সহজলভ্য যে সব মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাট পাওয়া যায় সেগুলি হল ইলিশ, খয়রা ও গুরজালি। মাছে দুই ধরনের ওমেগা ৩ ফ্যাট পাওয়া যায়— ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড (ডিএইচএ) ও ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিড (ইপিএ)। যদিও রক্তে স্বাস্থ্যকর মাত্রায় ও অনুপাতে কোলেস্টেরল নির্ধারণে ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড ও ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিড অধিক কার্যকরি, নিরামিষাশিরা কিছু শস্যবীজ থেকে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) নামে তৃতীয় এক ধরনের ওমেগা ৩ ফ্যাট গ্রহণ করতে পারেন। যে সমস্ত ভোজ্যতেলে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড পাওয়া যায় সেগুলি হল তিসির তেল (ফ্লাক্সসীড, ৫০%), ক্যানোলা তেল (১০%), সরিষার তেল (১০%), সয়াবিন তেল (৭%)। এ ছাড়াও অ্যামন্ড, ওয়ালনাট, চিনেবাদাম, সয়াবিনেও আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড আছে। গ্রহণ করার পরে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড শরীরে রাসায়নিকভাবে দ্রুত ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিডে ও ধীরে ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড ও ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিড ক্ষতিকারক ট্রাই-গ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা কমায় ও পূর্বে উল্লেখিত (ওমেগা ৩ ফ্যাটের) উপকারী শারীরবৃত্তিয় কাজগুলো করে।

সারণি ২ : বিভিন্ন মাছের মোট ফ্যাট ও ওমেগা ৩ ফ্যাট

প্রতি ১০০ গ্রামে	মোট ফ্যাট (গ্রাম)	ওমেগা ৩ ফ্যাট (গ্রাম)
সারডিন	১৬	৩.৩
ম্যাকারেল	১৩.৯	২.৫
ট্রাউট	৯.৭	১.৬
স্যামন	১০.৪	১.৪
ব্লু মাছ	৬.৫	১.২
বাগদা চিংড়ি	১.১	০.৩
গলদা চিংড়ি	০.৯	০.২
ভারতীয় সামুদ্রিক মাছ	০.৫-৫%	০.১-২.৯

ভারতীয় বাজারে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় মাছে (রুই, কাতলা) প্রোটিন, শর্করা ও ফ্যাট গ্রীষ্মকালে বেশি থাকে। আমাদের দেশের জনপ্রিয় মাছগুলির চেয়ে সামুদ্রিক ও সস্তা মাছে ওমেগা ৩ ফ্যাট বেশি থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম সমুদ্র-উপকূলে (কোচিন) যে মাছ পাওয়া যায় তাতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, মনোআন-স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (যার মুখ্যভাগই ওমেগা ৩ ফ্যাট) থাকে যথাক্রমে ৩৩-৪৫%, ১০-৩৩% ও ২০-৭৫%। ওমেগা ৩ ফ্যাটের বেশির ভাগ ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড আর ১০ শতাংশ ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিড।

বৈশিষ্ট্য ৪ : ট্রান্স-স্যাচুরেটেড ফ্যাট

এই ধরনের ফ্যাট সবচেয়ে ক্ষতিকারক। বিভিন্ন ধরনের প্যাকেটবন্দি খাবার এই ফ্যাটের উৎস ও অনেকাংশে মনুষ্যকৃত। খাবারের প্যাকেটে যদি ট্রান্সফ্যাট অথবা আংশিকভাবে হাইড্রোজেনযুক্ত তেল থাকে তবে সেই খাবার সম্পূর্ণভাবে পরিহারযোগ্য।

সারণি ৩ : বিভিন্ন ধরনের ফ্যাট ও শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রার উপর তার প্রভাব

ফ্যাটের ধরন	উৎস	কোলেস্টেরলের উপর প্রভাব		স্বাস্থ্যের উপর
		লঘু-গুরুত্ব (LDL cholesterol)	ঘনগুরুত্ব (HDL cholesterol)	প্রভাব
মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (ওমেগা ৯ বা ওলেইক অ্যাসিড)	অলিভ তেল, ক্যানোলা তেল, অ্যাভোকাডো, বিভিন্ন বাদাম, মাংস	কমায়	বাড়ায়	খুব উপকারী
পলিআনস্যাচুরেটেড (ওমেগা ৬)	বিভিন্ন শস্যবীজের তেল	কমায়	কমায়	উপকারী
পলিআনস্যাচুরেটেড (ওমেগা ৩ : ডিএইচএ* ও ইপিএ**)	মাছের পিঠের দিকের অংশ, তৈলাক্ত মাছ	কমায়	পরিবর্তিত হয় না	উপকারী
মনোআনস্যাচুরেটেড (ওমেগা ৩ : এএলএ***)	ফ্লাক্স সীড বা তিসির তেল, ক্যানোলা তেল	কমায়	পরিবর্তিত হয় না	উপকারী ও রোগপ্রতিরোধকারী
স্যাচুরেটেড	মাংস, দুগ্ধজাত খাদ্য, নারিকেল তেল ও পাম অয়েল	মোট কোলেস্টেরেলের মাত্রা বাড়ায় রক্তের মোট কোরেস্টেরলের ৯০ শতাংশের উৎস এই ফ্যাট		খারাপ ৭% অথবা দৈনিক ৬ গ্রামের উর্ধসীমা রাখা উচিত
ট্র্যান্স-স্যাচুরেটেড	ভাজা খাবার, সমস্ত বেকারির খাবার, চানাচুর	বাড়ায়	কমায়	সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়

**ডিএইচএ : ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড, **ইপিএ : ইকোসাপেন্টানেইক অ্যাসিড, ***এএলএ : আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড। ওমেগা ৩ ফ্যাট অনেক অপরিহার্য জীবকোষের শারীরবৃত্তীয় কাজে লাগে, রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড কমায়, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা কমায়।*

অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড তেল অধিক স্বাস্থ্যকর, কিন্তু এই ধরনের তেলে তৈরি খাবার বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে ক্রমে দুর্গন্ধযুক্ত ও বিস্বাদ (Rancid) অ্যালডিহাইড তৈরি হয়। তেল দিয়ে তৈরি খাবার দীর্ঘস্থায়ীভাবে সুস্বাদু রাখার জন্য প্যাকেটবন্দি খাবারের প্রস্তুতকর্তাদের তাই পছন্দ আংশিকভাবে হাইড্রোজেনযুক্ত তেল বা ট্রান্সফ্যাট। এটা সম্পৃক্ত তেল বা স্যাচুরেটেড ফ্যাটের চেয়েও ক্ষতিকারক। স্যাচুরেটেড ফ্যাট মাত্রা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য, কারণ এটা খারাপ লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল বাড়ানোর সাথে সাথে ভাল গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরলও বাড়ায়। ট্রান্সফ্যাট সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়, কারণ এটা একদিকে ভাল গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল কমায় ও অপরদিকে খারাপ লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল বাড়ায়। প্যাকেটবন্দি প্রক্রিয়াকৃত খাবার ছাড়া ট্রান্সফ্যাটের আর এক অন্যতম উৎস তেলে ডুবিয়ে ভাজা যে কোন খাবার। ভোজ্যতেলের মধ্যে ঘি, বনস্পতি ট্রান্সফ্যাট-পূর্ণ ও বর্জনীয়।

সারণি ৪ : ট্রান্সফ্যাটের প্রচলিত উৎস	
প্রচলিত ভারতীয় স্ন্যাক্স ও ফাস্ট ফুড	সিঙারা, চানাচুর, কাটলেট, বিভিন্ন ধরনের রোল, লুচি, পরটা, কচুরি।
বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত বেকারির খাবার	কেক, প্যাস্ট্রি, পিসা, ডোনাট, বিস্কুট, কুকিজ, সাদা পাঁউরুটি, রাস্ক
ভাজা খাবার	ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (আলুভাজা), ফ্রায়েড চিকেন (যে কোন তেলে ভাজা মুরগির মাংস)
অন্যান্য	স্যালাড ড্রেসিং, মার্জারিন

নিরামিষ বনাম আমিষ :

প্রায়শই শোনা যায় নিরামিষ খাবার বোধহয় স্বাস্থ্যের অনুকূল। নিরামিষাশিদের আবার রকমফের আছে। কেউ দুধ ঘি মাখন খায়, আবার কেউ বা ডিমভোজী নিরামিষাশী। যদিও মাংসে স্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে, মনে রাখতে হবে সব ধরনের স্যাচুরেটেড ফ্যাট কোলেস্টেরল বাড়ায় না। মাংসের স্যাচুরেটেড ফ্যাটের একটা অংশ স্টিয়ারিক অ্যাসিড, যেটা কোলেস্টেরল নিরপেক্ষ (বাড়ায় না)। মাংসে

পর্যাপ্ত পরিমাণে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট (ওলেইক অ্যাসিড) থাকে যেটা আবার কোলেস্টেরল কমায়। দৃশ্যমান চর্বি নেই এমন মাংস (lean meat) যাতে ফ্যাটের পরিমাণ ৯ শতাংশের নীচে থাকে সেটা ঘি, মাখন, চর্বি না তোলা দুধ (whole milk) যুক্ত নিরামিষ খাবারের চেয়ে স্বাস্থ্যকর। তবে সেই মাংসের রান্নার প্রণালী ভিন্ন, অল্প আঁচে কড়াইতে কেবল তেল মশলা দিয়ে নেড়েচেড়ে কষা চলবে না।

সারণি ৫ : কয়েকটি নির্বাচিত খাদ্যে রোগসৃষ্টিকারী, রোগপ্রতিরোধকারী ও নিরপেক্ষ ফ্যাট

খাবার		স্যাচুরেটেড ফ্যাট	মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট	
	মোট স্যাচুরেটেড	কোলেস্টেরল বর্ধক (স্টিয়ারিক অ্যাসিড) রোগ সৃষ্টিকারী	কোলেস্টেরল নিরপেক্ষ (ওলেইক অ্যাসিড) নিরপেক্ষ	কোলেস্টেরল হ্রাসকারী রোগপ্রতিরোধকারী
ভেড়ার মাংস	৫৪%	২৯%	২৫%	৩৩%
গো মাংস	৫১%	২৯%	২২%	৩৯%
শুকরের মাংস	৩৯%	২৭%	১২%	৪৫%
মুরগির মাংস	৩০%	২৪%	৬%	৪২%
মাখন	৬৬%	৫৩%	১৩%	২৮%
ঘি	ফ্যাটের অনুপাত মাখনের মতো এবং অতিরিক্ত ক্ষতিকারক কোলেস্টেরল অক্সাইডপূর্ণ।			

খাসির মাংসে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের অনুপাত ভেড়ার মাংসের চেয়ে বেশি।

ভোজ্য তেলের গুণাগুণ :

দুটি গুণের কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ পলিআনস্যাচুরেটেড তেল শ্রেয়। দ্বিতীয়ত নির্বাচিত তেলের ধূমাংক (smoke point), অর্থাৎ যে তাপমাত্রায় গরম করলে তেল থেকে ধোঁয়া বেরোয়, যত বেশি হবে সেটা তত উচ্চতাপমাত্রায় রান্নার পক্ষে উপযুক্ত। বিভিন্ন সুস্বাদু(!) রান্নার প্রয়োজনে শুকনো কড়াই বা প্যানে তেল ঢেলে গরম করতে থাকলে এক সময় তেল থেকে ধোঁয়া বের হতে শুরু করে। এই সময় তেল থেকে ক্ষতিকারক ''ফ্রি র‍্যাডিকলস'' তৈরি হয় যেটা সর্বতোভাবে পরিহারযোগ্য। সাধারণভাবে যে তেল যত পরিশোধিত (refined) তার ধূমাংক তত বেশি।

ধূমাংক অনুযায়ী ভোজ্যতেলগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

উচ্চ-ধূমাংকের ভোজ্যতেল, উচ্চ-মধ্যম ধূমাংকের ভোজ্যতেল, মধ্যম ধূমাংকের ভোজ্যতেল ও নিম্ন-ধূমাংকের ভোজ্য তেল। বেশি তাপমাত্রায় রান্নার জন্য উচ্চ ধূমাংকের তেলে ক্ষতি কম, অবশ্য সে তেলের অন্যান্য গুণাবলী মাথায় রেখেই তেলটি বাছা দরকার।

সারনি ৬ : উচ্চ ধূমাংকের ভোজ্যতেল : ভাজা খাবার ক্ষতিকারক জেনেও মাঝে মধ্যে যদি শখ হয় এই তেলে উচ্চ তাপমাত্রায় ভাজলে ক্ষতি কম হবে।

ভোজ্যতেল	মনোস্যাচুরেটেড	পলিআনস্যাচুরেটেড	স্যাচুরেটেড	মন্তব্য
অ্যামন্ড তেল	৬৫%	২৮%	৭%	
অ্যাভোকাডো তেল	৬৫%	১৮%	১৭%	
হ্যাজেলনাট তেল	৮২%	১১%	৭%	
পাম তেল	৩৮%	১০%	৫২%	পরিহারযোগ্য
সূর্য্যমুখি	৭৯%	৭%	১৪%	
রাইস ব্র্যান তেল	৪৭%	৮%	২২%	ভিটামিন ই সমৃদ্ধ, ভাজায় ২০% কম তেল লাগে, কোলেস্টেরল হ্রাসকারী ওরিজানল সমৃদ্ধ।
কুসুম (safflower) তেল	১৩%	৭৯%	৮%	
পরিশোধিত অলিভ তেল	৭৮%	৮%	১৪%	

সারণি ৭ : উচ্চ-মধ্যম ধূমাংকের ভোজ্যতেল : এই ধরনের তেল ওভেনে বেকিং আর উচ্চ তাপমাত্রায় স্বল্প সময়ের জন্য ভাজার বা ছোকার (stir frying, tossing, sauteing) জন্য উপযোগী।

ভোজ্যতেল	মনো স্যাচুরেটেড	পলি আনস্যাচুরেটেড	স্যাচুরেটেড	মন্তব্য
ক্যানোলা তেল*	৬২%	৩১%	৭%	আলফা লিনোলেইক অ্যাসিড সমৃদ্ধ
সরিষার তেল	৫৯%	২১%	১২%	ক্ষতিকারক ইউরিসিক অ্যাসিড থাকে
রেপসিড তেল	১৭%	৭৩%	১০%	বেশি ওমেগা ৩
এক্সট্রা-ভার্জিন অলিভতেল	৭৮%	৮%	১৪%	সেরা
বাদাম তেল	৪৮%	৩৪%	১৮%	ছোকার জন্য উপযুক্ত

**ক্যানোলা তেল : Brassica ও senapis গোত্রের এক ধরনের সরিষা বীজের জিনগত পরিবর্তন করে ক্যানাডায় আবিষ্কৃত তেল যাতে ক্ষতিকারক ইউরিসিক অ্যাসিডের বদলে উপকারি আলফা লিনোলেইক অ্যাসিড থাকে।*

সারণি ৮ : মধ্যম ধূমাংকের ভোজ্যতেল : কম তাপমাত্রায় বেকিং ও মধ্যম তাপমাত্রায় স্বল্প সময়ের জন্য ভাজার বা ছোকার জন্য উপযোগী।

ভোজ্যতেল	মনো স্যাচুরেটেড	পলি আনস্যাচুরেটেড	স্যাচুরেটেড	মন্তব্য
ভুট্টার (কর্ন) তেল	২৫%	৬২%	১৩%	ওমেগা ৬ সমৃদ্ধ
কুমড়োদানার তেল	৩২%	৫৩%	১০%	ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ
সয়াবিন তেল	২৫%	৬০%	১৫%	ওমেগা ৬ সমৃদ্ধ
ওয়ালনাট তেল	২৪%	৬৭%	৯%	ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ
নারিকেল তেল	৬%	২%	৯২%	অনুপযুক্ত।

সারণি ৯ : নিম্ন ধূমাংকের ভোজ্যতেল : রান্নায় ব্যবহার করা চলবে না। স্যালাডে ড্রেসিং হিসাবে ব্যবহারের জন্য।

ভোজ্যতেল	মনো স্যাচুরেটেড	পলি আনস্যাচুরেটেড	স্যাচুরেটেড	মন্তব্য
তিসির (flax seed) তেল	৬৫%	২৮%	৭%	এএলএ ধরনের ওমেগা ৩ ফ্যাট সমৃদ্ধ
অংকুরিত গমের তেল	৬৫%	১৮%	১৭%	ওমেগা ৬ ফ্যাট সমৃদ্ধ

এএলএ : আলফা লিনোলেইক অ্যাসিড

ভোজ্যতেলের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :

অলিভ তেল : এক্সট্রা-ভার্জিন : জলপাই থেকে প্রথমবারের নিষ্কাশনের পর পাওয়া তেল যেটা সেরা বলে পরিগণিত। এতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি থাকে।

ভার্জিন : জলপাই থেকে দ্বিতীয়বার নিষ্ক্রমণের পর পাওয়া তেল।

বিশুদ্ধ : পরিশোধিত ও প্রক্রিয়াকৃত করে পাওয়া জলপাই তেল।

এক্সট্রা-লাইট : বিশেষ প্রক্রিয়াকৃত করে পাওয়া হাল্কা রঙের প্রায় গন্ধহীন জলপাই তেল। উচ্চ তাপমাত্রায় রান্নার উপযোগী।

তেল নিষ্কাশনের উপায় :

ঘানির তেল : এই পদ্ধতিতে কোন রকম রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার না করে শস্যবীজকে সরাসরি চেপে তেল নিষ্কাশন করা হয়।

ঠান্ডা তাপমাত্রায় নিষ্কাশিত ঘানির তেল : উপরের পদ্ধতিতে তেল নিষ্কাশনের সময় ঘর্ষণজনিত উচ্চতাপ তেলকে অক্সিডাইজড করে দেয় বলে নিয়ন্ত্রিতভাবে কম চাপ ব্যবহার করে এবং ঠান্ডা তাপমাত্রায় নিষ্কাশিত পদ্ধতি তেল নিষ্কাশনের সেরা উপায়।

রাসায়নিক উপায়ে নিষ্কাশন : সস্তার তেল সমূহ হেক্সেন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রবণ ব্যবহার করে ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপাংক পর্যন্ত তাপমাত্রায় গরম করে নিষ্কাশন করা হয়। এতে তেলের উপকারি ভিটামিন ও অন্যান্য গুণসম্পন্ন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। তেলের প্যাকেটের ওপর যদি নিষ্কাশনের উপায় উল্লেখ করা না থাকে তবে ধরে নিতে হবে সেটা এই উপায়ে নিষ্কাশিত করা হয়েছে।

পরিশোধিত (refined, double refined) ও অপরিশোধিত তেল :

তেল নিষ্কাশনের পর তেলকে আরও উপাদেয় ও অধিক তাপমাত্রায় রান্নার উপযোগী করার জন্য তেলের মধ্যে ভাসমান ও অবাঞ্ছিত স্বাদ ও গন্ধের পদার্থগুলো পরিশ্রুত (ফিল্টার) করে বাদ দিয়ে পরিশোধিত তেল পাওয়া যায়। যদিও এই পদ্ধতি তেলকে অধিক তাপমাত্রায় রান্নার উপযোগী করে

তোলে, কিন্তু ভিটামিনসহ অনেক উপকারী গুণ তেল হারিয়ে ফেলে। অপর দিকে অপরিশোধিত তেল ঘানি থেকে সরাসরি বোতলবন্দি করা হয় আর এতে সাধারণত তীব্র ঝাঁজ ও গন্ধ থাকে। অপরিশোধিত তেল বেশি স্বাস্থ্যকর হলেও উচ্চ তাপমাত্রায় রান্নার জন্য অনুপযোগী আর তেল নিষ্কাশনের পর বেশিদিন ভালো থাকে না বলে অল্পদিনের মধ্যে ব্যবহার করে ফেলতে হয়।

এক নজরে

- ভোজ্যতেলের ধরন তেলের পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু তেল রোগ সৃষ্টিকারী, কিছু তেল উপকারি, আবার কিছু তেল নিরপেক্ষ।
- ক্যালোরির মাপে মোট প্রয়োজনের ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ অথবা দৈনিক ৪০ থেকে ৫০ গ্রাম ভোজ্যতেল গ্রহণ স্বাস্থ্যকর।
- ট্রান্সফ্যাট সর্বতোভাবে পরিহারযোগ্য।
- মাত্রাতিরিক্ত সম্পৃক্ত বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণে হৃদরোগ ও সেরিব্রাল স্ট্রোকের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এর উৎস প্রধানত ঃ ঘি, মাখন, নারিকেল ও তার তেল, মাংসের দৃশ্যমান চর্বি। প্রাপ্তবয়স্কের দৈনিক স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণের উর্দ্ধসীমা ক্যালরির মাপে ৭ থেকে ১০ শতাংশ বা ১০ থেকে ১৫ গ্রামের মধ্যে সীমিত রাখা উচিত।
- ডিমের কুসুম, মাংসের মেটে ও অন্যান্য প্রত্যঙ্গ, মুরগির মাংসের চামড়ায় স্যাচুরেটেড ফ্যাটের সাথে কোলেস্টেরলও থাকে।
- খাবারের মাধ্যমে সরাসরি যতটা কোলেস্টেরল শরীরে প্রবেশ করে, তার চেয়ে ১০ গুণ কোলেস্টেরল শরীরে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থেকে তৈরি হয়।
- ওমেগা ৩ যুক্ত (ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড বা ডিএইচএ এবং ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিড বা ইপিএ) পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট সবথেকে উপকারি ফ্যাট, আর না-ভাজা তৈলাক্ত মাছ এর প্রধান উৎস।
- দ্বিতীয় সেরা ফ্যাট হল মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট যার প্রধান উৎস ক্যানোলা, সরিষা, সুর্যমুখী, তিসি, অলিভ, অ্যামন্ড, অ্যাভোকাডো, হ্যাজেলনাট। এগুলো খারাপ লঘুঘনত্বের কোলেস্টেরল কমায় ও ভালো গুরুঘনত্বের কোলেস্টেরল বাড়ায়। মাংসেও যথেষ্ট পরিমাণে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। ক্যালোরির মাপে দৈনিক খাবারের প্রয়োজনের ২০ শতাংশ এই ধরনের ফ্যাট থেকে গ্রহণ করা উচিত।
- নারিকেলের তেল, পাম তেল, ঘি, মাখন হল সবথেকে ক্ষতিকারক ফ্যাট।
- ভাজার জন্য ব্যবহার করলে যে কোন তেলই অত্যন্ত ক্ষতিকারক ট্রান্সফ্যাট ও ফ্রি র‍্যাডিক্যালস-এ পরিণত হয়। মুচমুচে ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন। একবার ব্যবহার করা রান্নার তেল পুনরায় ব্যবহার করা অনুচিত।
- শৈশব অতিক্রম করার পর সর্বদা চর্বিনিষ্কাশিত (skimmed, fat < 0.5-1%) দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার ব্যবহার করা উচিত।

তাহলে কতটা তেল খাবেন, কোন তেল বাছবেন, আর কিভাবে রান্না করবেন, এগুলো আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করা যায় না, একসাথে ভাবতে হয়। তাই ভোজ্যতেল নিয়ে আমাদের জানা বৈজ্ঞানিক তথ্যরাশি অনেকটা দেবার পরেও, আরও অনেক কিছু বলার থেকে যায়— সেকথা বলা হবে স্বাস্থ্যের বৃত্তের পরের সংখ্যায়।

লেখক পরিচিতি : ডা. গৌতম মিস্ত্রি, এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, কার্ডিওলজিস্ট। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন।

With Best Compliments from :

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road
Kolkata 700027
Phone : 0332449-0144
Mob : 9830663724
Email : kloster_ pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প

পঞ্চম পর্ব

এদেশের গ্রামে চিকিৎসা-পরিষেবার হাল খুব খারাপ। সরকারি যেসব স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর গ্রামীণ হাসপাতাল আছে সেখানে ওষুধ যন্ত্রপাতি প্রায় কিছুই নেই, আছে শুধু জঞ্জালের স্তূপ। শহরের মাঝখানে মেডিকেল কলেজে বসে পাঁচ-দশ বছর পড়াশুনা করে যখন নতুন ডাক্তারেরা গ্রামের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তখন অনেকেই পালাবার পথ পান না। তবে সকলেই তো পালাবার লোক নন, তাঁরা শেষ অবধি না দেখে ছাড়েন না—সেই দেখার আর বাঁচার সত্যি কাহিনী শোনাচ্ছেন **ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত।**

[আগে যা জেনেছি : এই সংখ্যায় 'এক গাঁয়ের ডাক্তারের গল্প'-র পঞ্চম কিস্তি। প্রথম চার কিস্তিতে আমরা শুনেছি আদ্যোপান্ত 'কলকাতার ছেলে' অনিরুদ্ধ মেডিকেল কলেজে বছর-আষ্টেক ধরে পড়াশুনো আর শিক্ষানবিশি করার পর দিল্লিতে বড় হাসপাতালের আরামের চাকরি ছেড়ে হঠাৎ করেই ১৯৯০ সালে রাজ্য-সরকারের চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে, ডায়মন্ডহারবারের কাছাকাছি পান্ডববর্জিত পাড়াগাঁ বেলপুকুরে গেঁড়ে বসলেন।

ডাক্তারের কোয়ার্টার ভাঙাচোরা, সাপের আড্ডা। সুতরাং অন্য একটা ছোটো কোয়ার্টারে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করে ফেলতে হল। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার আছে, সুতরাং প্রায় গায়ের জোরে ট্রান্সমিটার থেকে লাইন টেনে হাসপাতালে ইলেকট্রিক কানেকশন আনতে হল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ওষুধ-বিষুধ আনতে গিয়ে জেলার প্রধান মেডিকেল অফিসারের বাবুরা প্রায় সব ওষুধ 'সাপ্লাই নেই' লিখে দিলেন।

এই সবের মধ্যেও রোগী দেখা আর রোগ সারানোর ফলে মানুষজন ডাক্তারকে ভালবাসে ফেললেন। ডাক্তার যেটুকু সামান্য যন্ত্র আর সুবিধা পেলেন তা কাজে লাগিয়ে, গতানুগতিক নিয়ম ভেঙে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে মাথায় রেখে, সার্জারি করতে লাগলেন, আর রোগীকে বাঁচানো গেল। শুরুতে ছিল খালি বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন—গ্রামের হাসপাতালে সামান্যতম ব্যবস্থা থাকে না, রোগী ভোগে অপারেশন-পরবর্তী বীজাণু-সংক্রমণে। অনিরুদ্ধের স্ত্রী কনীনিকা সাথে যোগ দিলেন; সংক্রমণ রুখতে উপযোগী ব্যবস্থা কার্যকর করা হল। অন্য হাসপাতাল ফেরত অপারেশনের রোগী প্রথমে বাধ্য হয়ে, তারপর ডাক্তারকে প্রায় জোরজার করে, বেলপুকুরে বেশ বড় অপারেশন করিয়ে ছাড়ল, আর এইভাবে এমন অনেকের প্রাণ বেঁচে গেল। হাসপাতাল-কর্মী আর গ্রামের মানুষ জেনারেটর ভাড়া করে, কেরোসিনের ব্যবস্থা করে, অপারেশন চালু রাখলেন।

একসময়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে 'বড়'

অপারেশন করা হল, সহকারীরা হাসপাতালের সাধারণ স্টাফ ও স্থানীয় কিছু মানুষ— নিজের উৎসাহে তাঁরা কঠিন কাজ শিখে নিলেন। রোগীর ভালোভাবে যত্ন করার সাথে সাথে গ্রামের দাইরা কেউ কেউ শিখে নিলেন কি করে অপারেশনের যন্ত্রপাতি ও অন্য জিনিসপত্র বীজাণুমুক্ত করতে হয়। অনিরুদ্ধ অপারেশনের পরে রোগীদের তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়ে দিতেন, আর ছুটির সময় নিজে রোগীর ব্যান্ডেজ পালটে বাড়ির লোকেদের রোগীর যত্ন বুঝিয়ে দিতেন। বেলপুকুর হাসপাতালে একটা ভাঙাচোরা প্রসবঘরে অপারেশন করতে হত—কিন্তু এইসব পদক্ষেপের ফলে বীজাণু-সংক্রমণের হার ছিল মেডিকেল কলেজের চাইতে কম। প্রয়োজনের তাগিদে তাড়াতাড়ি ছুটি দেওয়া শুরু করলেও অনিরুদ্ধ দেখলেন বিলেতে রুরাল সার্জারি আর ডে-কেয়ার সার্জারি তাঁর কাজের সাথে একই মূলমন্ত্রে গাঁথা।

গ্রামের হাসপাতালে যেরকম ব্যবস্থা তাতে পথ-দুর্ঘটনায় পড়া মানুষের ইমার্জেন্সি অপারেশন করা অসম্ভব ব্যাপার। অনিরুদ্ধ তাঁর টিম তৈরি করেছিলেন সাধারণ সার্জারির কথা ভেবেই, কিন্তু সাধারণ সার্জারির মধ্যেও ইমার্জেন্সি অবস্থা তৈরি হয়, আর সেই অবস্থার মোকাবিলা করতে করতে সেই টিম জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে শেখে, পথ-দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের দ্রুত চিকিৎসা করে বাঁচানো সম্ভব হয়।

একবার একটি ছেলের প্রস্রাবের নলের ভিতরকার অংশটি দুর্ঘটনায় ছিঁড়ে গেলে অনিরুদ্ধ তার ওপর জটিল অপারেশন করতে চাননি। কিন্তু কলকাতার বড় হাসপাতালে রোগী ভর্তি হতে না পেরে তাঁর কাছেই ফিরে এল। বাধ্য হয়েই অনিরুদ্ধ বেশ জটিল 'ইউরেথ্রোপ্লাস্টি' অপারেশন দুটো ধাপে করলেন, রোগী ভাল হয়ে গেল।

আর এইসব কাজের ফল ফলল অভাবিত সব দিক দিয়ে। গভীর রাত্রে বাসে ডাকাতি হল, অনিরুদ্ধর ঘড়ি নিয়ে নিল ডাকাত। ক'দিন পরে সেই ডাকাতের বাবা অনিরুদ্ধর বাসায় এসে ক্ষমা চেয়ে নিজের কেনা একটি ঘড়ি দিতে এলেন। এক ডাক্তারবাবু সব ধরনের মানুষের কাছে কিভাবে 'অন্য মানুষ' হয়ে ওঠেন, সেটা আমরা দেখলাম।]

ইমার্জেন্সি অপারেশন আর ফুটবল মাঠ

লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত ট্রেন যাবে। প্রথম ধাপে নিশ্চিন্তপুর অব্দি— পরের বছর বাকিটা। কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম ঠেলাগাড়িতে মাটি উঁচু করে নিয়ে গ্রামের ছেলেরা হাসপাতালের সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে। জিজ্ঞাসা করতে বলল যে রেললাইনের জন্য বাঁধ তৈরি করার জন্য মাটি যাচ্ছে। সপ্তাহখানেক বাদে একদিন তাড়াতাড়ি আউটডোর শেষ হয়ে যেতে দেখতে গেলাম কিভাবে রেললাইন তৈরি হচ্ছে। হাসপাতাল থেকে প্রায় ১ কিমি দূরে, সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর থেকে এঁকে বেঁকে বাঁধটা এগিয়ে এসেছে।

যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এসেছি, সেই রাস্তা দিয়ে ঠেলা বোঝাই করে মাটি আনছে একদল লোক, ঠেলা থেকে ঝুড়ি করে মাটি ফেলে আর এক দল বাঁধটা উঁচু করছে। লম্বা লম্বা অনেকগুলো দাগ দেওয়া খুঁটি পোঁতা আছে— ওই দাগ পর্যন্ত মাটি ফেলা হবে। রোগা, লম্বা, চশমা-পরা একজন ভদ্রলোক কাজ তদারকি করছিলেন। এগিয়ে এসে নিজেই পরিচয় দিলেন—এই কাজটার কন্ট্রাক্টার। মাস তিনেকের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে, তাই এখানেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকছেন। বললেন, ''আপনার কাছে তো সব সময়েই এত ভিড় থাকে যে আর বিরক্ত করিনি। পরে একদিন যাব আড্ডা দিতে।''

কয়েকদিন বাদে বেলপুকুর হাসপাতালের নার্স, দুর্গাদি, এসে আর্জি জানালেন যে এই বছর উনি হাসপাতালের জমিতে চাষ করবেন। বেলপুকুর হাসপাতালের এলাকার মধ্যে বেশ কিছুটা চাষের জমিও ছিল—এটা প্রায় সব গ্রামীণ হাসপাতালেই আছে, অবশ্য কোন কোনও ক্ষেত্রে পুকুরও থাকতে পারে। সেই জমি অথবা পুকুর চাষের জন্য ভাড়া দেওয়া যায়। ভাড়া-বাবদ আয় কলকাতা গিয়ে ট্রেজারিতে জমা দিলে, তার কিছুটা হাসপাতালের উন্নয়নের কাজের জন্য পরের বছর পাওয়া যায়। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে এই টাকার পরিমাণ এতই সামান্য অথচ জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াটা এতই শক্ত আর সময়সাপেক্ষ যে বেশিরভাগ জায়গাতেই কর্মীদের পালা করে চাষ করতে দেওয়া হয়ে থাকে— বেলপুকুর হাসপাতালেও তাই হচ্ছিল। দুর্গাদি চাষের আর্জি জানানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব কর্মী— রামপাল হেলা, সুলেমান আর কৌশল্যা— আপত্তি জানাল। তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল কে কবে কাকে পালা ছেড়ে দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি তর্ক থামাবার জন্যে বললাম, ''ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা নিয়ে পরে ভেবে দেখব।'' এই বলে ফুটবল খেলতে চলে গেলাম মাঠে—মাঠ বলতে হাসপাতাল আর বড় রাস্তার মাঝখানে ছোট্ট কিছুটা জমি— দুটো ব্যাডমিন্টন কোর্টের মতন আয়তন। মাঠে ঘাস নেই, উপরন্তু খোয়া আছে, বল বেশিদিন টেঁকে না। কিন্তু উপায় নেই, কারণ চারিদিকে চাষের নিচু জমি আছে, কিন্তু দু'কিমি দূরে নিশ্চিন্তপুর স্কুলের চেয়ে কাছাকাছি কোনও খেলার মাঠ নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কোয়ার্টারের বারান্দায় বসে হঠাৎ মাথায় এল— হাসপাতালের সম্পত্তি চাষের জমিতে মাটি ফেলে উঁচু করে ফেললে তো খেলার মাঠও হয়ে যাবে, আর চাষ করা নিয়ে ঝগড়াও বন্ধ। মাস্টারমশাই অর্থাৎ সুদর্শন বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম— চাষের জমিটা ভরাট করতে কত গাড়ি মাটি লাগতে পারে, আর কত টাকা খরচা হবে। সুদর্শনবাবু হিসেব-টিসেব করে বললেন টাকার অঙ্কটা। আজ আর সেটা মনে নেই, কিন্তু মনে আছে যে সেটা আমার মাসিক মাইনের থেকে বেশি শুনে খুব হতাশ হয়েছিলাম।

মাস খানেক বাদে এক বৃহস্পতিবার অপারেশন শেষ করে হাসপাতালে বসে গল্প করছি, এমন সময়ে সেই কন্ট্রাক্টার ভদ্রলোক এসে হাজির, সঙ্গে দুলালবাবু। দুলালবাবু হলেন আর একজন স্থানীয় মাস্টারমশাই, যিনি প্রথম অপারেশন-এর সময়ে একটা টুলে দাঁড়িয়ে টর্চ দিয়ে আলো দেখিয়েছিলেন। দুলালবাবু বললেন— কন্ট্রাক্টারবাবুর সব থেকে দক্ষ কর্মীর স্ত্রী রাত্রি ১১টা থেকে পেটযন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। কন্ট্রাক্টারবাবুর এই কর্মীটিই একমাত্র লোক যে বুলডোজার চালাতে পারে, আর বুলডোজার ছাড়া কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে থাকবে। রোগীকে হাসপাতালে আনতে বললাম। দোলায় করে রোগীকে নিয়ে আসতে আসতে প্রায় রাত্রি একটা বেজে গেল। বিবরণ শুনে ভেবেছিলাম হয়ত পিত্তপাথুরি, পিত্তথলির মুখে পাথর আটকে গিয়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু পরীক্ষা করতে গিয়ে পেটে হাত দিয়েই চমকে গেলাম। রোগী স্থির হয়ে শুয়ে আছন, পেটটা কাঠের মতন শক্ত। নাড়ী দুর্বল, দ্রুত। সন্দেহ করলাম অন্ত্রনালির কোথাও ফুটো হয়ে 'পেরিটোনাইটিস' হয়ে গিয়েছে। আশিস-সুলেমান'রা একটু বিশ্রাম নিতে গিয়েছিল, কারণ পরের দিনই আবার বন্ধ্যাকরণ অপারেশন হবে। রঞ্জিতাকে বলামাত্র ৫ মিনিটের মধ্যে স্যালাইনের সরঞ্জাম আর নাকে দেওয়ার রাইলস টিউব তৈরি, কমলা রোগী থাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছে আর সিন্ধু চা আনতে ভীমের দোকানে; আজ রাত্রে আর ভীমের ঘুমের সুযোগ হবে না। স্যালাইন শুরু করে নাক দিয়ে রাইলস টিউবটা ঢোকাবার আগেই বাসুদেব, আশিস, নাসির আর সুলেমান চলে এল। আধ ঘন্টার মধ্যে অপারেশনের জন্যে সবকিছু তৈরি। আমি তখনও একটু দ্বিধা করছিলাম কারণ এই রকম রোগীর পেটের মধ্যে ঠিক কি হয়েছে তা না খুললে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না। কিন্তু কোনোরকম পরীক্ষা করার সুযোগও নেই, সবথেকে কাছের এক্সরে করার ব্যবস্থা ২৬ কিমি দূরে ডায়মন্ডহারবারে। কন্ট্রাক্টারবাবুর এক নম্বর চিন্তা এত রাত্রে এই রোগী নিয়ে মহকুমা হাসপাতালে যাবার গাড়ি কি করে পাবেন। আর দুনম্বর চিন্তাটাও কম নয়— মহকুমা হাসপাতালে থাকাকালীন ওর স্বামীকে তো টানা ছুটি নিতে হবে, তাহলে রেললাইনের কাজ বন্ধ। তার উপরে আবার চিকিৎসার খরচটাও ওনাকেই বহন করতে হবে।

হাসপাতালের কর্মীরা সকলেই নতুন অপারেশন দেখার আশায় মহকুমা হাসপাতালে না পাঠাবার অনুরোধ করতে থাকল। তাদের আমার উপরে অগাধ ভরসা। কিন্তু একমাত্র আমিই জানি যে পেটকে ম্যাজিক-বক্স বলা হলেও, সেই ম্যাজিক সব সময়ে খুব আনন্দদায়ক হয় না। আমার স্ত্রী কনীনিকার সাথে পরামর্শ করার উপায় নেই—পরের দিন ভোর থেকে ডিউটি আছে বলে কাকদ্বীপ ফিরে গিয়েছে। শেষে অপারেশনটা করব বলেই স্থির করলাম।

কন্ট্রাক্টারবাবু ভীষণ খুশী হয়ে চা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে ফেললেন, আর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অপারেশনটা নিজে দেখবেন। সাবধান করলাম, ''মাথা ঘুরে যেতে পারে— অজ্ঞান হয়ে যেতে হলে অপারেশান থিয়েটারের বাইরে গিয়ে অজ্ঞান হবেন।'' আর শুনিয়ে রাখলাম, রোগী ভাল না হলেও যা যা খরচ হবে তা দিতে হবে, কারণ যেসব যন্ত্রপাতি আর ডিসপোজেবল দিয়ে অপারেশন হবে সেগুলো আমার সম্পত্তি নয়, সরকারি জিনিসও নয়। এগুলো অন্য রোগীর— অগ্রিম জমা দিয়ে গিয়েছে। উনি বললেন, ''ডাক্তারবাবু, আপনি সে নিয়ে চিন্তা করবেন না— আমি কালই সব পূরণ করে দেব। আর জানেন তো, আমি কলেজে নকশাল ছিলাম, কত অ্যাকশান করেছি। আমার নার্ভ খুব শক্ত— রক্ত দেখে আমার কিছু হবে না।''

রাত্রি আড়াইটে নাগাদ অপারেশন শুরু হল। পেট খুলতেই বুঝলাম পেপটিক পারফোরেশন। ডুয়োডেনাম বলে অন্ত্রের একটা অংশ আছে, তার দেওয়ালে ছোট্ট একটা ফুটো হয়ে গেছে, আর সে ফুটো দিয়ে খাবারদাবার আর অন্ত্রনালির রস বেরিয়ে পেটের গহ্বরের ভেতরে চলে এসেছে। এই ফুটোটা বন্ধ করতে যা সময় লাগলো তার থেকে অনেক বেশিক্ষণ লাগলো বেরিয়ে আসা পদার্থগুলো বারেবারে স্যালাইন ঢেলে ধুয়ে পেটের গহ্বরটি পরিষ্কার করতে, কারণ এইগুলো থাকলে (অথবা অপারেশন করতে দেরী হলে) সংক্রমণ হওয়া আর সে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই মহিলার ক্ষেত্রে অবশ্য দেরী হয়নি, ডুয়োডেনামের দেওয়ালে ফুটো হবার ৪ ঘন্টার

মধ্যেই অপারেশনটা হয়ে গেল।

ভোর চারটের মধ্যে রোগীকে আবার বিছানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কন্ট্রাক্টারবাবু বাইরে বসে ছিলেন—শুরুতেই ওনার মাথা ঘুরতে শুরু করায় অপারেশনটা দেখার সাধ পূরণ হয়নি। ফুটো হওয়ার পরে অপারেশন হতে বেশি দেরী না হওয়াতে পেপটিক পারফোরেশনে যেটা সবচেয়ে ভয় অর্থাৎ সংক্রমণ বা ইনফেকশন হয়ে সেপ্টিক পেরিটোনাইটিস— সেটাও হয়নি। পাঁচদিন বাদে রোগীকে ভাত খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। দশদিনের মাথায় রোগী আবার এল সেলাইগুলো কাটতে— আগের বার এসেছিল দোলায় চড়ে, এবারে এল নিজের পায়ে হেঁটে।

সপ্তাহ-দুয়েক বাদে কন্ট্রাক্টারবাবু আবার এসে হাজির। বললেন ''ডাক্তারবাবু, আমি হাসপাতালের জন্যে কিছু করে দিতে চাই। কিন্তু ছোট ব্যবসায়ী, বেশি বড় কিছু করে দেবার ক্ষমতা নেই।'' বললাম, ''একটা কাজ শুধু করে দিন— হাসপাতালের যে চাষের জমিটা আছে, সেটাতে মাটি ফেলে ভরাট করে দিন, ফুটবল মাঠ হয়ে যাবে।'' এক সপ্তাহের মধ্যে জমি ভরাট হয়ে, বুলডোজার চালিয়ে, দুই দিকে পাকা গোলপোস্ট বসিয়ে, বেলপুকুর হাসপাতালের ফুটবল মাঠ তৈরি হয়ে গেল। নির্মলবাবু, মানিক, সুন্দর ইত্যাদির নেতৃত্বে ছোট ছেলেরা অন্য জায়গা থেকে চাপড়া ঘাস কেটে এনে বসিয়ে দিল। এক মাসের মধ্যেই সবুজ আর সমতল একটা চমৎকার ফুটবল মাঠ তৈরি। বেলপুকুর অঞ্চলের প্রধান, নারায়ণ, ওঁর বাবার স্মৃতিতে একটা শিল্ড দিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। এখনও প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতাটা চলেছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন মহকুমা শাসক আর মহকুমা স্বাস্থ্য-আধিকারিক এসেছিলেন। স্বাস্থ্য আধিকারিক আমাকে একটু কড়া ভাবেই বললেন, ''এই সব করার আগে আমাকে জানানো উচিত ছিল— চাষের জমি, অন্য কিছু করতে গেলে নিয়মকানুন মেনে করতে হত।'' বললাম, ''তাহলে আর কি, আমাকে শো কজ করে দিন।'' বলাই বাহুল্য, শো-কজ নোটিশ কদাপি আসেনি। বেলপুকুরে ওটাই একমাত্র খেলার মাঠ যেটায় দু-তিনটে গ্রামের ছেলেরা ফুটবল খেলে, আর প্রতি বছর আমাকে যেতে হয় শিল্ড প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের জন্যে।

ইমার্জেন্সি অপারেশন আর রক্তদান—

সকাল থেকেই অল্প অল্প ব্যথা হচ্ছিল। মহিলার মাস ছয়েক আগে বিয়ে হয়েছে—দুই মাস মাসিক বন্ধ আছে। রাত্রি দু'টো নাগাদ যন্ত্রণা প্রবল বেড়ে গেল আর মহিলার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাড়ির লোকরা নিয়ে গেলেন কাকদ্বীপ হাসপাতালে। কল-বুক গেল ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে এমনকি পেট টিপেও সেরকম কিছু পেলেন না। মাসিক বন্ধ আছে— তাই একটা স্যালাইন চালু করে দু'একটা ইঞ্জেকশন লিখে দিয়ে আবার কোয়ার্টারে চলে গেলেন। রোগীর স্বামী—'কী হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করতে বললেন, ''ও কিছু না, প্রথম বাচ্চা তো ... ও ঠিক হয়ে যাবে।'' ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আবার কল-বুক গেল— রোগী কেমন জানি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কল বুক-এর সঙ্গে বাড়ির লোকও গিয়েছে। ডাক্তারবাবু বিরক্ত হলেন— রোগীকে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সটা অন্য রোগী নিয়ে গিয়েছে, তখনও ফিরে আসেনি। তাই রোগীর স্বামী কোনোমতে একটা অটো জোগাড় করলেন। কিন্তু সে-অটোতে তেল খুব কম, আর পেট্রল পাম্পগুলো এখনও খোলার সময় হয়নি। মাঝরাস্তায় থেমে যেতে পারে জেনেও রোগী নিয়ে তাঁরা রওনা দিলেন। ঘটনাচক্রে বেলপুকুর হাসপাতালের পাশ দিয়েই মহকুমা হাসপাতালে যাবার রাস্তা।

বেলপুকুর হাসপাতালের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, হাসপাতালের মাঠে খুব ভীড়— অনেকগুলো ভ্যান-রিক্সা আর কয়েকটা অটোও দাঁড়িয়ে। গতকাল বন্ধ্যাকরণ অপারেশান ছিল— আজ তাদের ছুটি, তাই বাড়ীর লোকেরা ভ্যান ইত্যাদি রিজার্ভ করে নিয়ে এসেছেন। অটো-চালকের পরামর্শে আর রোগীর অবস্থা সঙ্গিন দেখে তাঁরা আমাকে দেখাবার জন্যে রোগী নিয়ে ঢুকে পড়লেন।

তখনও আউটডোর খুলতে দেরী আছে, আমি ছুটি দেওয়ার আগে প্রতিটি রোগীর ড্রেসিং পালটে ওষুধপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। বাসু এসে বলল, ''দাদা, একটা খুব সিরিয়াস কেস এসেছে কাকদ্বীপ থেকে— ওখানকার ডাক্তার পারেনিকো। আপনার নাম শুনে এসেছে— একবার দেখে নেবেন।'' এমনভাবে অনুরোধ করলো যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম— ''তোমার চেনা?'' সুলেমান-নাসির-আশিস প্রত্যেকেই আমার সন্দেহ সমর্থন করলো। বাসু প্রচন্ড ভাবে প্রতিবাদ করেও আবার অনুরোধ করলো। ক্রমশ জেনেছিলাম যে বাসুর যে কোনও মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়ার এমন একটা সহজাত প্রবণতা ছিল যে এমনকি অনেক সময়েই নিজের অসুবিধা করে ও আমার গালাগালি-বকুনি খেয়েও তাদের হয়ে তদ্বির করতো।

রোগীকে পরীক্ষা করে দেখলাম পেটটা নরমই আছে শুধু তলপেটের দিকে একটু ব্যথা, কতকটা অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতন। কিন্তু নিশ্বাস এবং নাড়ী ভীষণ দ্রুত, রক্ত চাপ এতই কম যে প্রায় মাপাই যাচ্ছে না। ব্যাপারখানা কী? হঠাৎ মনে পড়ে গেল মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জেন্সিতে অ্যাপেন্ডিসাইটিস মনে করে ভর্তি করা চার-পাঁচজন রোগীর কথা। মোটামুটি এই রকম বয়স, উপসর্গ আর লক্ষণ। অপারেশন করতে গিয়ে তাদের রাপচারড এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি (Ruptured Ectopic Pregnancy) পাওয়া গিয়েছিল। রোগীর বাড়ীর লোকদের ডেকে আমার সন্দেহের কথা বললাম, আর এটাও বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে এই রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্ত দেওয়া প্রয়োজন— নিকটতম ব্লাড-ব্যাঙ্ক ডায়মন্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে, তাই সেখানে নিয়ে যাওয়াই ভাল। রোগীর স্বামী আর বাবা ইতিমধ্যে ছুটি পাওয়া কয়েকজন রোগীর সাথে কথা বলে কেমন বুঝে নিয়েছেন এখানে যেন সবই ঠিক হয়ে যায়। তাঁরা বারবার অনুরোধ করতে থাকলেন বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশনটা করে দেওয়ার জন্যে। হাসপাতালের সব কর্মীরাও সারারাত জাগার ক্লান্তি ভুলে গিয়ে নতুন একটা অপারেশন দেখার উৎসাহে আমাকে উপরোধ শুরু করল। ইতিমধ্যে রোগীকে

স্যালাইন চালিয়ে দিয়েছি, জোরে— পেটের ভিতরে রক্তক্ষরণ সামলাবার জন্যে রক্তের বদলে নুনজল অর্থাৎ স্যালাইন, দুধের পরিবর্তে ঘোল, বা পিটুলিগোলাই বলা যায়। রেফার করার সময়ে কাকদ্বীপ হাসপাতাল থেকে স্যালাইনটাও খুলে দিয়েছিল।

খুব দ্বিধা করেও রাজী হলাম, কিন্তু রক্তের কি ব্যবস্থা হবে? এক অটো-মালিক নিজের স্ত্রীকে নেওয়ার জন্যে এসেছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, ''ডাক্তারবাবু, আপনি আমাকে রক্ত আনার সব কাগজপত্র আর স্যাম্পেল বুঝিয়ে দিন। ওখানে আমার একজনের সাথে ভাল আলাপ আছে। আমি ঠিক 'সাইজ' করে নিয়ে আসছি।''

সুলেমানকে ডাকলাম— যন্ত্রপাতি, গজ ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ শুরু করতে বলব। শুনলাম যে আমি যখন রক্তের ইনডেন্ট করছিলাম, তখনই ও অটোক্লেভ করা শুরু করে দিয়েছিল। প্রত্যেক কর্মীই ছুটি হওয়া রোগীদের মাধ্যমে নিজেদের বাড়িতেও খবরও পাঠিয়ে দিয়েছে যে বাড়ি ফিরতে আরও দু-তিন দিন দেরী হবে। সুলেমান আর রঞ্জিতাকে জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম যে পেটের বড় অপারেশন করার জন্যে যা যা প্রয়োজন, ওরা সবই গুছিয়ে ফেলেছে। আমি ওদের তিনটে স্যালাইনের খালি বোতলের মুখের কাছে গজ দিয়ে ছাঁকনির মতন তৈরি করে একটা আলাদা ড্রামে অটোক্লেভ করতে বললাম। ইতিমধ্যে গতকালের সব রোগীই বাড়ি চলে গিয়েছে, কেবল সেই অটো মালিকের স্ত্রী আছেন।

অটোক্লেভ শেষ হতেই অপারেশন শুরু হল। অজ্ঞান করাটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা ছিল। ওপেন ইথার ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু এই রকম রোগীর ক্ষেত্রে খুব সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন। অবশ্য আশিস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও, এই কাজ করে করে দারুন পোক্ত হয়ে উঠেছে। অজ্ঞান ঠিকই হয়ে গেল। তারপর পেট খুলতেই দেখা গেল ভেতরে রক্ত ভর্তি। আমার অনুমানই সঠিক। পেটের ভিতরে জমা রক্ত মুখে গজ-বাঁধা বোতলগুলোতে আঁজলা করে নিয়ে ভরতে শুরু করলাম। জমাট বাঁধা রক্তের টুকরোগুলো গজের ছাঁকনিতে আটকে গেল। এই ভাবে প্রায় আড়াই বোতল রক্ত পাওয়া গেল। প্রয়োজনে রোগীর নিজের এই রক্তটাই আবার এই রোগীকে দেওয়া যাবে—একে বলে অটো-ট্রান্সফিউসন। ডায়মন্ডহারবার থেকে রক্ত নিয়ে আসতে তিনঘন্টাও লেগে যেতে পারে, সুতরাং এটাই একমাত্র উপায়। অপারেশনের বাকিটুকু করতে বেশি সময় লাগলো না। ফ্যালোপিয়ান টিউবটার ফেটে যাওয়া অংশটুকু আর নষ্ট হয়ে যাওয়া অতি-ক্ষুদ্র ভ্রুণটা বাদ দিতেই রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। মায়ের পেটের মধ্যে বাচ্চাটা অতি ক্ষুদ্র আকারে প্রথম তৈরি হয়, 'এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি' হলে সেই ক্ষুদ্র ভ্রূণটি ঠিক জায়গায়, অর্থাৎ মায়ের জরায়ুতে না হয়ে অন্য জায়গায় হয়। অনেক ক্ষেত্রেই জরায়ুর গায়ে লাগানো সরু নল 'ফ্যালোপিয়ান টিউব'-এর মধ্যে ভ্রূণ তৈরি হয়। আর ভ্রূণটা ভুল জায়গায় যখন বাড়তে থাকে তখনই বিপদ বাধে, সরু ফ্যালোপিয়ান টিউবটার মধ্যে তার বাড়ার জায়গা কোথায়? ফলে ফ্যালোপিয়ান টিউবটা যায় ফেটে, ইংরাজি করে বললে 'রাপচার' হয়ে যায়। একেই বলে রাপচারড এক্টোপিক প্রেগন্যান্সি। সেটাই হয়েছিল, আর তাই ফ্যালোপিয়ান টিউবটার ফেটে যাওয়া অংশটুকু আর নষ্ট হয়ে যাওয়া অতি-ক্ষুদ্র ভ্রূণটা বাদ দিতে হল। তারপরে পড়ে থাকা রক্ত স্যালাইন দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ফেলতেই অপারেশন শেষ। আসল অপারেশন-এর অংশটুকু সহজ হলেও, দেরী হলে রক্তক্ষরণের ফলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

পেটের ভিতর থেকে আঁজলা করে তোলা রক্তটা অবশ্য এই রোগীকে দিতে হয়নি। যে ভাবেই হোক সেই অটো মালিক ঠিক দু-ঘন্টার মধ্যে দু-বোতল রক্ত নিয়ে পৌঁছে গেলেন। সাতদিন বাদে সেলাই কেটে দেওয়ার পরে মহিলা বাড়ি চলে গেলেন। তাঁর বাড়ির লোকেরা আমাদের প্রভূত প্রশংসা করলেও আমি মনে মনে কাকদ্বীপ হাসপাতালের সেই ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ(!) জানালাম; তিনি যদি সজাগ হয়ে এই রোগীর পালস রেট আর প্রেসারটা দেখতেন তাহলে হয়ত আমার কাছে এই রোগী আসত না, আর বেলপুকুর হাসপাতালের কর্মীদেরও একটা নতুন অপারেশন দেখা হত না। এই রোগীর ছুটি হয়ে যেতেই সব কর্মীদেরই হাঁটাচলা পালটে গেল, বেড়ে গেল আত্মবিশ্বাস। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতো বেলপুকুর হাসপাতালে কী কী অপারেশন হয় তো তারা বলত, ''কী অপারেশন চাই, অ্যাঁ? আমাদের কাছে কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড— সব ফেল। ওদের সব ডেঞ্জার ডেঞ্জার অপারেশন আমরা সাইজ করে দিচ্ছি। দাদা (অর্থাৎ আমি) থাকতে আমাদের সাথে ওরা কেউ পারবে না।'' সামনে স্বীকার করি না করি, কথাগুলো বেশ খাসা লাগত। ভুল! ভুল ভাঙতে সময় বেশি লাগেনি অবশ্য।

ভুল

মেডিকেল কলেজে ইন্টার্নশিপ চলাকালীন লেবাররুমে বাচ্চা হওয়া দেখভাল করার কাজ শেখার সময় আসি এন্তার ফাঁকি দিয়েছিলাম। তিনমাস লেবাররুম ডিউটি ছিল— আমি একদিনই ঢুকেছিলাম। বাকি দিনগুলো ওয়ার্ডের কাজগুলো করে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার সার্জারিতে চলে যেতাম। ধারণা ছিল যে এই বিদ্যাটা আমার আয়ত্ব না করলেও চলবে। এটা যে কত বড় ভুল করেছিলাম সেটা বুঝেছিলাম বেলপুকুর হাসপাতালের দায়িত্ব নেবার পরে। রাত্রি দশটার পরে হাসপাতালে আমি একা। একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স, দুর্গাদি, কিন্তু তাঁর দুই চোখেই এমন ছানি যে দিনের বেলাতেও প্রায় কিছু দেখতে পান না। আমার এখনও মনে আছে আমার হাতে প্রথম প্রসবের কথা। রোগীকে ভর্তি করে ছুটে কোয়ার্টারে গিয়ে প্রফেসার সি এস দাঁ-র লেখা বইটা নিয়ে এসেছিলাম। এমবিবিএস পরীক্ষার সময়েও এত মন দিয়ে প্রসবের অধ্যায়টা পড়িনি। তারপরে অবশ্য ছ-সাতটা প্রসব নির্বিঘ্নে হওয়াতে ভয়টা কমে গিয়েছিল; কিন্তু সবাই জেনে গিয়েছিল যে এই কাজটা আমি মোটেও খুশী মনে করি না।

একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার পরে, হাসপাতাল থেকে কিলোমিটার-তিনেক দূরে নদীর ধারের একটা গ্রাম থেকে এক অন্তঃসত্ত্বাকে নিয়ে বাড়ীর লোক এসে হাজির। সন্ধ্যবেলাতেই প্রসবের ব্যথা শুরু হয়ছে, রাত ১১টা নাগাদ জল ভেঙে গেল, কিন্তু গ্রামের দাইমা আত্মীয়-বাড়ি গিয়ে ফিরতে পারেননি, তাই হাসপাতালে আসা। পরীক্ষা করে দেখলাম বাচ্চাটার মাথাটা স্বাভাবিক অবস্থানে, অর্থাৎ নিচের দিকে নেমে এসেছে। বাচ্চার হৃদযন্ত্রের বেগও ঠিকই আছে। আন্দাজ করলাম ভোরের দিকেই প্রসব হয়ে যাবে। রাত্রি দুটো নাগাদ আবার পরীক্ষা করে একটু একটু চিন্তা হতে লাগল। মাথাটা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে—আর-একটু নামা উচিত ছিল। বাচ্চাটা অবশ্য ঠিকই আছে বলে মনে হল, কিন্তু ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। একবার ভাবলাম কুলপি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যদি রাস্তায় বা কুলপি হাসপাতালে যাওয়া-মাত্র প্রসব হয়ে যায় তাহলে খুবই লজ্জার হবে। ইন্টার্নশিপের সময়ে এই প্রশিক্ষণটা ঠিকঠাক না নেওয়ার জন্যে আবার নতুন করে আক্ষেপ হতে লাগল।

এই দোটানার শেষে ভোররাত্রে সাড়ে-চারটে নাগাদ বাড়ির লোকদের বললাম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে। বললাম—প্রসব রাত্রের পরে আর এগোয়নি, আর তাছাড়া বাচ্চাটারও অবস্থাটাও ভাল মনে হচ্ছে না। আমি যদিও স্বীকার করলাম যে আরও আগে পাঠিয়ে দিলে বোধহয় ভাল হত, কিন্তু তখন গাড়ির ব্যবস্থা করে রোগীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ততার মধ্যে এই কথাটা বাড়ির লোকেরা খুব একটা মন দিয়ে শুনল না। তারপর সারাদিনই আউটডোরে রোগী দেখা আর নানা কাজের মধ্যেও বাচ্চা আর মা কেমন আছে সেই চিন্তাটা মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সারাদিন কোন খবর পেলাম না। রাত্রি সাড়ে-দশটা নাগাদ মেয়েটির বাবা ফিরলেন। বারান্দায় বসে দেখলাম তিনি বাস থেকে নেমে সোজা আমার কাছে আসলেন। উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ''কি? মেয়ে কেমন আছে?'' ক্লান্ত, বিষণ্ণ ভাবে উনি বললেন, ''ডাক্তারবাবু, মেয়ে ঠিকই আছে কিন্তু বাচ্চাটিকে রাখা গেল না। ওখানকার ডাক্তারবাবু বললেন যে বড্ড দেরী হয়ে গেছিল। এই বাচ্চা সিজার করাই ঠিক হত। মেয়েটা আমার খুব ভেঙে পড়েছে—ভাবছি কালকেই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসব। কোনও অসুবিধা হতে পারে কি?'' কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল না, ছিল আমার উপরে অগাধ বিশ্বাস। অন্তত এই ক্ষেত্রে আমি এই মর্যাদার যোগ্য ছিলাম না। ওনাকে বলার চেষ্টা করলাম যে এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিও কিছুটা দায়ী কিন্তু উনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ''না, ডাক্তারবাবু, আপনি তো যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন সারা রাত্রি জেগে। এর থেকে বেশি কি-ই বা কেউ করতে পারে? ওখানে একজন ডাক্তারবাবুর সাথে আমার জামাইয়ের ঝগড়া হয়ে গিয়েছে, তিনি আপনার নামে খারাপভাবে কথা বলছিলেন বলে।''

পরে জেনেছিলাম যে মহকুমা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ যখন দেরী করে রেফার করার জন্যে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন, বাড়ির লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে এমন প্রতিবাদ করে যে তিনি তাঁর মন্তব্য ভুল বলে স্বীকার করতে বাধ্য হন। অথচ তিনি সত্যিই তো ভুল কিছু বলেন নি! এই ঘটনার ফলে আমি কুলপি হাসপাতালে গিয়ে মাঝে মাঝে ওখানকার দুজন দক্ষ নার্সের কাছে প্রসব করানোর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছিলাম। এছাড়া বেলপুকুর হাসপাতালে প্রতি রাত্রে একজন অভিজ্ঞ দাই উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। এরকম ভুল আর কোনোদিন করিনি— কিন্তু এখনও আক্ষেপ রয়ে গিয়েছে। আর সেই ভদ্রলোকের কথা মনে করে লজ্জা লাগে। তাঁর অসীম আস্থার যোগ্য হয়ে উঠতে আমি তো সত্যিই পারিনি, আর অজাত সন্তানের জন্য মা-বাবার শোক, সেই ক্ষতিটাও পূরণ হবার নয়। এই ঘটনা থেকে আমি আমার মতো করে শিক্ষা নিয়েছি। চেষ্টা করেছি নিজের সাধ্যমতন যাতে এ রকম ভুল আবার না করি।

লেখক পরিচিতি : ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত, এমবিবিএস। বর্তমানে ওয়ার্ল্ড হেলথ্ অর্গানাইজেশন (WHO)-এ জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন।

- কাশি কমাতে কাফ সিরাপ খাওয়া অযৌক্তিক। জল বেশি খান, আদা জাতীয় কিছু চুষুন, গরম জলের ভাপ নিন।
- জন্ডিসের (বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস-এ) কোন ওষুধ হয় না, আপনা আপনি সারে। ক্ষিধে ফিরলে সবকিছু খান।

কুইজ

উত্তর :

১। হাওয়েল জলি বডি।
২। রেডিয়াল নার্ভের দূরতর প্রান্তের উপরিস্তরের শাখা।
৩। থাইরয়েড ক্যানসার।
৪। ফ্লি-র কামড়।
৫। কন্যাভ্রূণ হত্যারোধ।
৬। সেপ্টোপ্লাস্টি।
৭। জেন্টামাইসিন।
৮। এতে বেশি ঘুম পায় না।
৯। স্ফিনয়েড সাইনাস।
১০। এপিফোরা।
১১। সিস্টোসিল বা মূত্রথলি-স্খলন।
১২। পোলিও-মাইলাইটিস।
১৩। Chivalier Jackson Tube।
১৪। John Heysham Gibbon।
১৫। ১১ এপ্রিল।

সূর্যরশ্মি থেকে ত্বকের একটি সমস্যা

সূর্যের আলো থেকে ত্বকের সমসা পলিমরফিক লাইট ইরাপশন সম্পর্কে লিখছেন **ডা. শর্মিষ্ঠা দাস।**

মার্চ মাসের প্রথমদিকে একদিন— চেম্বারের প্রথম রোগীটি পাঁচ ছয় বছরের এক শিশু—নামী স্কুলে পড়ে। সমস্যা দু-গালে সাদা সাদা ছোপ। বাবা-মা-র চোখেমুখে চরম উৎকণ্ঠা— ''খারাপ কিছু নয় তো?''

কিছু পরে আর একজন ২৫ বছরের রোগিনী— আই টি সেক্টরে চাকরি করে, যেমন ঝকঝকে চেহারা তেমন আধুনিক পোষাক— কিন্তু দু-হাতের বাইরের দিকে এবং গলার সামনে ''V'' আকৃতির খোলা জায়গায় এক গাদা ফুসকুড়ি। মেয়েটি খুব ডিপ্রেসড — চুলকুনির কষ্ট ছড়াও, সামাজিকভাবে ও চাকরির জায়গায় খুব বিব্রত বোধ করছে।

আরো পরে এলেন গ্রামের এক নিম্নবিত্ত ঘরের গৃহবধূ— ''কি হইছে হাতে গলায় দ্যাখেন তো! সারাদিন চুলকাইতে চুলকাইতে আলা হইয়ে গেলাম!''

আর এক পুরুষ রোগী— সিভিল ইঞ্জিনীয়ার, হাতের বাইরের দিকে, গলায়, কপালে কালো ছোপ, ফুসকুড়ি; চামড়া মোটা হয়ে গেছে।

এইসব রোগীরা বিভিন্ন বয়স, পেশা ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের হলেও তারা কিন্তু একই ভৌগোলিক অঞ্চলের বাসিন্দা আর তাদের সমস্যার কারণটা এক— সূর্যরশ্মিজনিত বিভিন্ন আকৃতির স্ফোটক, ডাক্তারি পরিভাষায় পলিমরফিক লাইট ইরাপশন (Polymorphic Light Eruption)।

এই সমস্যাটা ঠিকমত বোঝার জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সূর্যরশ্মির বিশ্লেষণটা একটু জানা দরকার।

নানা রকম আলো : পৃথিবীতে যে সূর্যরশ্মি পৌঁছায় তার শতকরা পাঁচভাগ অতিবেগুনী রশ্মি —তার মধ্যে ৯৫-৯৮ ভাগ অতিবেগুনী A রশ্মি আর ২-৫ ভাগ অতিবেগুনী B রশ্মি। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (ন্যানোমিটারে মাপা) ভিত্তিতে সূর্যরশ্মিকে এইভাবে ভাগ করা যায়:

অতিবেগুনী সি রশ্মি (UVC)	অতিবেগুনী বি রশ্মি (UVB)	অতিবেগুনি এ রশ্মি (UVA)	দৃশ্যমান আলোকরশ্মি	অবলোহিত রশ্মি (infrared)
২০০-২৮০ ন্যানোমিটার	২৮০- ৩২০ ন্যা.মি.	৩২০-৪০০ ন্যা.মি.	৪০০-৭৬০ ন্যা.মি.	>৭৬০ ন্যা.মি.

মানুষের ত্বকের কোষের 'মেলানিন' নামক রঞ্জক পদার্থ কাজ করে আলোকশোষণকারী (Chromophobe) কণা হিসাবে। অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে Chromophobe কণা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ত্বকের কোষের নানা প্রত্যঙ্গে, বিশেষত ডিএনএ-র কিছু স্থায়ী ও কিছু অস্থায়ী পরিবর্তন হয়। এই ভাবে সূর্যরশ্মি দ্বারা ত্বকের একশোটিরও বেশি সমস্যা হতে পারে।

দৃশ্যময় আলো ও অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকের যে অতি পরিচিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে — পুড়ে যাওয়া (sunburn), কালো হয়ে যাওয়া, ক্রমাগত রোদে পুড়ে স্থায়ী তামাটে হয়ে য়াওয়া (Suntan), শরীরের অনাবৃত অংশে ত্বকে চুলকানিযুক্ত পুরু ও খসখসে পরিবর্তন (Solar Keratosis), ক্রমাগত কোষের ডিএনএ-র ক্ষতি হতে হতে ইলাস্টিন, কোলাজেন জাতীয় কলা নষ্ট হয়ে চামড়ার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে কুঁচকে যাওয়া (photoaging), সূর্যরশ্মির স্পর্শকাতরতাজনিত বিভিন্ন আকৃতির স্ফোটক (Polymorphic Light Eruption), ফুলে যাওয়া ও চুলকানো (solar urticaria)। এছাড়া আছে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়া ও বিভিন্ন ত্বকের ক্যানসারের প্রকোপ বৃদ্ধি।

এই সব সমস্যার মধ্যে সূর্যরশ্মিজনিত বিভিন্ন আকৃতির স্ফোটক নিয়েই আজকের আলোচনা।

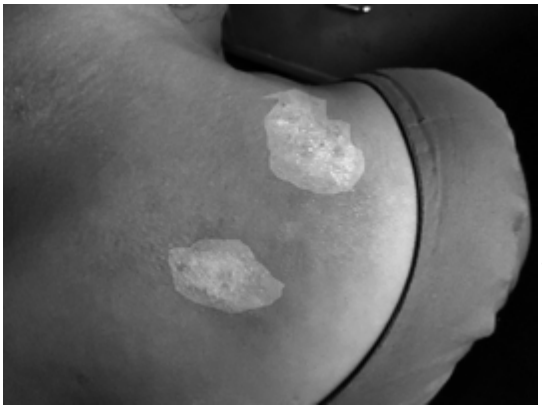

পলিমরফিক লাইট ইরাপশন :

প্রথমে যে সব রোগীদের কথা বলা হল তাদের সঙ্গে একটু কথা বললে এবং নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করলেই রোগের কারণ পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যে শিশুটি স্কুলে যায় সে প্রার্থনার সময় ও টিফিন পিরিয়ডে অনেকক্ষণ রোদে থাকে। দ্বিতীয়জন, আই টি সেক্টরে চাকুরে, অনেকটা খোলামেলা পোষাক পরে ও অফিসে যাওয়া আসার পথে একদম রোদ এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। তৃতীয়জনের গ্রামের বাড়িতে রান্নাবান্না ও অন্যান্য ঘরকন্নার কাজ উঠোনে খোলা জায়গায়, সুতরাং অনাবৃত অংশে পুরো সকাল ও দুপুর জুড়ে রোদ লাগে। চতুর্থ জন, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারকে অনেকটা সময় কাজের খাতিরেই রোদে থাকতে হয়।

যাদের ত্বক সূর্যরশ্মিতে স্পর্শকাতর, তাদের সাধারণত গ্রীষ্মের প্রথমে, অনেক সময় শীতকালে এবং পুরো গ্রীষ্মকাল জুড়ে এই সমস্যা দেখা যায়। পলিমরফিক লাইট ইরাপশন বা PLE র জন্য মূলত দায়ী UVA রশ্মি, কিন্তু UVA ও UVB রশ্মি উভয়ে মিলেই রোগটা তৈরি করে। UVA রশ্মির ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হল জানলার কাঁচ ভেদ করেও এই রশ্মি ঢোকে — তাই গাড়িতে চড়ে বেরোলেও এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

PLE-র স্ফোটক সাধারণত হাতের বাইরের দিকে, গলা ও বুকের সামনে ''V'' আকৃতির অনাবৃত জায়গায়, কখনো মুখেও দেখা যায়, ছোট ফুসকুড়ি, ফোস্কা, লালচে হয়ে যাওয়া, চাকা চাকা হয়ে ফুলে যাওয়া এই সবই এর লক্ষণ। এই লক্ষণগুলো রোদ

লাগার কয়েকঘন্টা পরে শুরু হয়। চুলকানি থাকে। লক্ষণ ও আক্রান্ত অঞ্চলের বিন্যাস দেখে সহজেই এই রোগ শনাক্ত করা যায়। Systemic Lupus Erythematosus (SLE) নামক একটি গুরুতর রোগেও শরীরের সূর্যালোক প্রাপ্ত অঞ্চলের ত্বকে নানারকম স্ফোটক ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তার সঙ্গে জ্বর, গাঁটে ব্যথা আরো অন্যান্য লক্ষণও থাকে। PLE একটি খুব সাধারণ সমস্যা, কিন্তু কখনো SLE-র মত গুরুতর রোগের সন্দেহ দূর করার জন্য প্রয়োজন মনে করলে ত্বকের 'বায়োপ্সি' ইত্যাদি পরীক্ষা করতে হতে পারে।

কী করবেন?

PLE-র সমস্যা যাদের থাকে দীর্ঘদিন ধরে চলতেই থাকে, প্রতিবছর গ্রীষ্মের প্রথমে বাড়ে। হতাশ হবার কিছু নেই — সমস্যার কারণটা মাথায় রেখে একটু নিয়ম মেনে চললেই ভালো থাকা সম্ভব।

যতটা সম্ভব ঢাকা জামাকাপড় পরে বাইরে বেরোতে হবে। তাতে অসুবিধা হলে নিজের পছন্দের পোষাকের উপর একটা অ্যাপ্রন জাতীয় পোষাক চাপানো যেতে পারে শুধু রোদ লাগার সময়টুকুর জন্য। আজকাল দু-চাকার বাহন চালান যাঁরা অনেকেই এই সমস্যা এড়ানোর জন্য লম্বা দস্তানায় হাত ও কাপড়ের ফেট্টি দিয়ে মুখ ঢেকে নেন — এটাও খুব ভালো ও কার্যকর। এছাড়া UVA ও UVB রশ্মি প্রতিরোধকারী সানস্ক্রীন মাখতে হবে—রোদে বেরোনোর একটু আগে শরীরের অনাবৃত অংশে। যে সাদা দাগ ও স্ফোটক সৃষ্টি হয়ে গেছে সেগুলো কমানোর জন্য ক্যালামাইন লোশন ও হাল্কা ধরনের স্টেরয়েড মলম দেওয়া হয়। চুলকানি কমানোর জন্য অ্যালার্জির ওষুধ খেতে হয়। এসব কোনো কিছুতেই না কমলে ও রোগের তীব্রতা খুব বেশি হলে অনেক সময় মুখে খাবার স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ, হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এগুলোও ডাক্তার বিবেচনামত দিয়ে থাকেন। রোগীর বয়স, ওজন ও তীব্রতা অনুযায়ী ডোজ নির্ধারিত হয়।

আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যরশ্মিকে সঙ্গে নিয়েই আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে হবে। সবসময় অন্দরমহলে থাকা বা দিনের বেলা বাইরের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। একথা মাথায় রেখে যাঁরা PLE-র সমস্যায় ভুগছেন তাঁদের একটু নিজেকে সূর্যরশ্মি থেকে বাঁচানো অভ্যাস করে নিতে হবে। সানস্ক্রীন বস্তুটিও মহার্ঘ্য, সাধারণ মানুষ সারাবছর সেটা ব্যবহার করতে পারেন না। সানস্ক্রীন ছাড়াও ছাতা, চারদিকে ঢাকা টুপি (পানামা হ্যাট), ফুলহাতা জামা— এগুলো কাজের জিনিস। মহিলারা যাঁরা খোলা জায়গায় গৃহকর্ম করেন, দিনের বেলায় একটু শাড়ীর আঁচল বা ওড়না গায়ে পিঠে জড়িয়ে নেওয়া অভ্যাস করলে নিখরচায় এই সমস্যা থেকে কিছুটা মুক্তি পাবেন।

লেখক পরিচিতি— ডা. শর্মিষ্ঠা দাস, এমবিবিএস, ডিভিডি, একটি সরকারি হাসপাতালে ত্বকরোগবিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক।

With Best Complements from :

KLM

www.klmlab.com

KLM LABORATORIES PVT. LTD.

An ISO 9001 2008 Certified Company

দুর্ঘটনা-উত্তর মানসিক পীড়া

প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হোক বা মানবসৃষ্ট, দুর্ঘটনার অভিঘাতে মনের যে রোগ— তা নিয়ে লিখছেন **ডা. সুমিত দাশ।**

দেবাশিস মহাপাত্র। বাড়ি জগৎসিংহপুর, উড়িষ্যা। বন্ধু অনন্তর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল পারাদ্বীপ। দুদিন ভালোই কেটেছিল। সেদিন সকাল থেকেই ছিল বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া। রেডিওতে সতর্কবাণী ছিল ঝড়ের। ক্রমে বাড়ল ঝড়। সমুদ্রের এরকম ভয়ঙ্কর রূপ আগে কখনও দেখেনি। পাহাড়ের মত ঢেউগুলো প্রবল আক্রোশে তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল—ঢুকে পড়েছিল অনেকদূর। এই সময় নোটিশ এল পারাদ্বীপ ছাড়ার— ঝড় আরো বাড়বে। আতঙ্কিত লোকজন ভেবে পাচ্ছিল না কোথায় কিভাবে পালাবে। একটা ট্রেকারকে বেশি ভাড়া দিয়ে বাদুড়ঝোলা অবস্থায় কিছুটা গেছিল। কিন্তু ঝড়ের দাপটে ট্রেকারওয়ালা আর যেতে রাজি হয়নি। তারা কোনমতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল একটা ক্লাবঘরের ছাদে - কারণ তখন জল বাড়ছে। ওরা দুই বন্ধু জড়াজড়ি করে বসেছিল। ভয়ঙ্কর আওয়াজ, ঝড়ের মাতন আর বৃষ্টির মাঝে কতক্ষণ বসেছিল জানে না। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে মনে হলো যেন গোটা সমুদ্রটা তীব্র আক্রোশে ধেয়ে আসছে। পরে শুনেছিল ঢেউয়ের উচ্চতা ৩৫ ফুট উঠেছিল। অনন্ত জলের তীব্র তোড়ে একটা ক্ষীণ আওয়াজ করে ওর হাত ছেড়ে বেরিয়ে গেল আর দেবাশিস কিভাবে যেন একটা উঁচু আমগাছের মগডালে আটকে গেছিল। ও বেঁচে যায়।

উড়িষ্যা সুপার সাইক্লোন হয় ১৯৯৯ সালে।

আমরা তার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে দেবাশিসকে মেডিক্যাল ক্যাম্পে দেখি — সে তখন পাথরের মত হয়ে গেছে, হঠাৎ চমকে ওঠে, চোখ বুঁজলে বা স্বপ্নে দেখে তার হাত ছেড়ে যাওয়া বন্ধু অনন্তকে, জোরে বাতাস বা ঢেউ ওকে আতঙ্কিত করে। দেবাশিস ভালো করে খেতে পারে না, ঘুমাতে পারে না। যে রোগটার শিকার দেবাশিস হয়েছিল তাকে বলে দুর্ঘটনা উত্তর মানসিক পীড়া বা Post Traumatic Stress Disorder সংক্ষেপে PTSD।

রোগের ইতিহাস :

এই রোগের ইতিহাস আর পাঁচটা রোগের থেকে একটু আলাদা। দেখা গেছে যুদ্ধবাজ সৈনিক এবং আক্রান্ত কিন্তু জীবিত সাধারণ মানুষের মধ্যে এই রোগ সমানভাবে দেখা যায়। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর অতিক্রিয়া এবং তার ফলে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা যেমন বুক ধড়পড়, হাঁপানি ইত্যাদি বেশি দেখা যেত মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক সৈন্যদের মধ্যে। তাই তখন রোগটাকে বলা হত 'সৈনিকের হৃদয়' বা 'soldier's heart'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঐরকম লক্ষণযুক্ত মানুষজনকে বলা হত শেল শক (Shell Shock) অর্থাৎ কামানের গোলার আঘাতের পরে বেঁচে গিয়েও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত মানুষ। এরপর এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা রোগটার বর্তমান রূপটাকে চেনাল। নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ফেরত মানুষ, জাপানে অ্যাটম বোমার আঘাতের পরেও জীবিত মানুষ, যুদ্ধ ফেরত সৈনিক—এদের মধ্যে রোগটার একটা সংঘবদ্ধ রূপ পাওয়া গেল। এরপর ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত সেনাদের মধ্যেও এই রোগটি দেখা গেল। পরবর্তীকালে দেখা গেল জীবনে কোন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া—যেমন যুদ্ধ, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, সুনামি, যানবাহন দুর্ঘটনা, জ্বলন্ত বাড়ি থেকে রক্ষা পাওয়া, ধর্ষণ, পুলিশ বা অন্য মানুষের অত্যাচারে এই রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ :

আমরা সিনেমায় দেখি বা উপন্যাসে পড়ি, কোন দুর্ঘটনার পরে একটি চরিত্র একেবারে রোগা হয়ে গেল, বা অস্বাভাবিক আচরণ করছে। কোথাও দেখান হয় সেই দুর্ঘটনার কথা ভাবলে তার শরীরে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। এসবগুলো হচ্ছে ঐ রোগের খন্ডচিত্র। রোগের উপসর্গ সত্যিই এক অর্থে নাটকীয়তায় ভরা।

সাধারণত দুর্ঘটনার সম্মুখীন মানুষটি নিজে হতে পারে, আবার দেখতেও পারে অন্য কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেছে বা ভয়ঙ্কর আহত হয়েছে। আর আক্রান্ত মানুষটির প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক এবং অসহায়তা, তার মনে এই দুর্ঘটনার ছবি বারবার ভেসে আসে এবং তাতে সে কষ্ট পায়। বারবার দুঃস্বপ্ন দেখে। বাইরের বা নিজের মনের মধ্যের কোন সঙ্কেত যদি সেই ঘটনাকে মনে পড়িয়ে দেয় তবে সে ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে এমন আচরণ করে যেন সামনে সেই দুর্ঘটনা ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে তার অলীক শ্রবণ বা অলীক দর্শন হতে থাকে। এর ফলে যেটা হয় সে ঘটনার সঙ্গে জড়িত সব বিষয়কে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। সে চেষ্টা করে ঘটনা সম্পর্কিত চিন্তা, কথাবার্তা, মানুষজন এবং জায়গা এড়িয়ে যেতে। অনেক ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বিশেষ কিছু বিষয় মনে করতে পারে না। নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। দেখা যায় সে ঘুমাতে পারছে না, মনোযোগ দিতে পারছে না, চমকে উঠছে এবং হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাচ্ছে।

রোগের কারণ :

রোগের নাম থেকেই বোঝা যায় দুর্ঘটনাই এই রোগের মূল কারণ। কি ধরনের দুর্ঘটনায় মানুষকে এই রোগের শিকার করে তুলতে পারে তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

১। **যুদ্ধ :** রোগের ইতিহাসেই দেখা গেছে বিভিন্ন যুদ্ধকালীন এই রোগের আদিরূপ থেকে বর্তমান রূপে বিবর্তন কাহিনী। যাইহোক ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকে হালের ইরাক আফগানিস্তান যুদ্ধ সবক্ষেত্রেই PTSD দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে PTSD র আচরণ খুব গণতান্ত্রিক। বেঁচে যাওয়া যোদ্ধা এবং সাধারণ মানুষ উভয়ই সমান ভাবে ভোগেন।

২। **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** আমি উড়িষ্যার সুপার সাইক্লোনে একজন মানুষের PTSD আক্রান্ত হওয়ার

ঘটনা দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। এছাড়াও আছে বহু প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা ও তার ফলে হওয়া PTSD। ২০০৪ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর সুনামিতে ভারত সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে প্রায় ৩,০০,০০০ লোক মারা যান। বেঁচে যাওয়া বহু মানুষের PTSD হয়। ৪ই অক্টোবর ২০০৫-এ যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প কাশ্মীর, আফগানিস্তান, পাকিস্তানে হয় তাতে ৮৫,০০০ লোক মারা যান। এবং বহু মানুষ এ রোগের শিকার হন। এছাড়া হারিকেন, বন্যা, দাবানলের পরেও ঐ রোগ হয়।

৩। **অত্যাচার :** শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের কারণেও অনেকের PTSD হয়। বর্তমান অস্থির সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ চলছে। কোথাও দুটি দেশের মধ্যে, কোথাও নিজের দেশে গৃহযুদ্ধ চলছে। সাধারণ মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে পুলিশ মিলিটারী। লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হচ্ছে। আর বাড়ছে PTSD, এছাড়া নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষের উপর অন্য মানুষের অত্যাচারেও হচ্ছে PTSD।

আছে দৈনন্দিন জীবনে নানা দুর্ঘটনা। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট, বাড়ি ভেঙে যাওয়া, বাড়ি থেকে হাসপাতাল সবেতেই আগুন লাগা ইত্যাদি। এসব কারণেও হয়ে চলছে PTSD।

রোগের ভবিষ্যৎ : দেখা গেছে প্রাথমিক আঘাতের এক সপ্তাহের মধ্য থেকে ৩০ বছর বাদেও এই রোগ হতে পারে। রোগের উপসর্গের কমা বাড়া হয়। চিকিৎসা না করলেও শতকরা ৩০ ভাগ রোগী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। ৪০ ভাগের অল্প কিছু উপসর্গ থাকে, ২০ ভাগের মাঝারি উপসর্গ থাকে আর ১০ ভাগ ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। যে সব ক্ষেত্রে রোগের প্রকাশ তাড়াতাড়ি ঘটে, কম সময় থাকে এবং রোগ হওয়ার আগে রোগী সামাজিক ভাবে সুস্থিত থাকে, নেশার সমস্যা বা অন্য কোন রোগ থাকে না তাদের ভবিষ্যৎ ভালো হয়।

খুব ছোটরা এবং খুব বয়স্করা এই রোগাক্রান্ত হলে সহজে নিষ্কৃতি পায় না। খুব ছোটদের ক্ষেত্রে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়াকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সঠিক ভাবে তৈরি হয় না। আর খুব বয়স্কদের এই মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া এটা গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই এই দুই মেরুর বাসিন্দাদের PTSD হলে সহজে সারানো যায় না।

চিকিৎসা :

রোগীর খাওয়া দাওয়া ও স্বাভাবিক চাহিদার দিকে নজর দিতে হবে। রোগীকে দুর্ঘটনার কারণ কি, সে বিষয়টা কি তা সঠিক ভাবে জানাতে হবে। তাকে ধীরে ধীরে দুর্ঘটনার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনে পেশাদার মনোবিদের সাহায্য নিতে হবে। দরকার হলে কিছু ওষুধ খাওয়াতে হবে।

এবার আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলি—আমরা বন্ধুবান্ধব মিলে মন্দারমনি বেড়াতে গেছিলাম। প্রায় পনেরো জনের বিরাট দল। আমাদের হোটেলের সামনে নিচে একটা দশ ফুট বাহুওয়ালা ত্রিভুজের মত গর্ত ছিল। ভাটার সময় গোড়ালি থেকে হাঁটু জল। আবার তার ওদিকেও বিচ। জোয়ারে আমরা সব সমুদ্রে নেমেছি। ঐ ছোট্ট পুকুরটিও জলের তলায়, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পর আমি আর আমার এক বন্ধু তীরে বসে ডাব খাচ্ছি, বন্ধু পত্নীদের সঙ্গে গল্প গুজব করছি। একটু পরেই মনে হল আমার ঐ বন্ধুর ছেলেটা, বছর দশেক বয়স, জলে বেশ সমস্যায় পড়েছে। আমি সাঁতার জানি এগিয়ে গেলাম, বন্ধুটি সাঁতার না জানলেও নিজের সন্তানের কথা ভেবে জলে নামল। কাছাকাছি গিয়ে আন্দাজে বুঝলাম সেই নিরীহ পুকুর জোয়ারে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে কারণ পায়ে মাটি পাচ্ছিলাম না। ওখানে একটা খনির মত রয়েছে। বন্ধুর ছেলেটি সাঁতার শিখছে, ও চেষ্টা করছে যে ভাবে হোক ভেসে থাকতে। আমি যেতেই ও আমার গলা জড়িয়ে পুরো শরীর দিয়ে গায়ে চেপে বসে, আমি ডুবে গিয়ে প্রায় দম আটকে যায়। কোনরকমে ভেসে উঠে ওকে ছাড়িয়ে একটা হাত ধরে টানতে গিয়ে দেখি সামনে একটা ঢেউ। আমার সর্বশক্তি দিয়ে ওকে টেনে নিয়েও নিজে ভাসার জন্যে শেষ মুহূর্তে ওর হাতটা ছেড়ে দিই। আমার বন্ধুটি ছেলে পর্যন্ত আসতে পারেনি কিন্তু জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার নিজেরও আর শক্তি নেই কাউকে সাহায্য করার মত। যাইহোক প্রচুর জলটল খেয়ে ওরা দুজন এবং আমি শেষ পর্যন্ত পাড়ে উঠি। আমাদের পুরো দলটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আনন্দ অনেকটাই মাটি হয়ে যায়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে দুতিনদিন হতভম্ব হয়ে যাই, ভালো করে ঘুমাতে পারিনি। খালি মনে হয় আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ছিলাম, বাচ্চাটি যদি মারা যেত। ঘটনার অভিঘাতে আমি এখনও সমুদ্রে নামলে বেশি দূর যাই না, অল্প সময় থাকি। পাঠকরা বিচার করুন এটা PTSD কিনা।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুমিত দাশ, এমবিবিএস, ডিপিএম, মনোরোগবিদ। জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতে যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের এক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক।

মৃগী রোগের খিঁচুনী আরম্ভ হলে জোর করে আটকাবেন না। আশপাশ থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে দেবেন যাতে আঘাত না লাগে। খিঁচুনী শেষ হলে একদিকে কাত করে শুইয়ে দিন।

আশার ছলনে ভুলি

ক্যান্সার চিকিৎসায় সাইবার নাইফ

*চিকিৎসা যতো জটিল, মানুষের প্রাণ নিয়ে যতো টানাটানি, সে-সম্পর্কে রোগী আর তাঁর স্বজনদের খানিকটা স্বচ্ছ ধারণা রাখার জন্য ঠিকঠাক তথ্যের ভূমিকা ততো বেশি। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ফেরে সেই তথ্য প্রায়শয়ই একপেশে হয়ে পড়ে। ক্যানসার চিকিৎসায় **সাইবার নাইফ**-এর ভূমিকা ঠিক কতটা আর কোথায়—লিখছেন* **ডা. সুস্মিতা ঘোষাল।**

প্রবাসী বাঙালি, তিনদিনের বাসি আনন্দবাজার পত্রিকা আদ্যোপান্ত পড়ি। বিজ্ঞাপনও বাদ দিই না। একদিন পড়লাম যে কোন এক ক্যান্সার রোগীকে সব ডাক্তার জবাব দেওয়ার পর নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাঙ্গালোরে, থুড়ি বেঙ্গালুরুতে—সেখানে চিকিৎসার পর তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। আহা, তিনি ভালো থাকুন, সুখে থাকুন। তবে সেখানকার এমন বিশাল্যকরণীর নামটা তো জানা দরকার! বিজ্ঞাপনটা সাইবার নাইফের—আধুনিক যুগের কম্পিউটার চালিত অব্যর্থ নিশানার রেডিওথেরাপি মেশিন। ভারতবর্ষে মাত্র গুটিকতক হাসপাতালে এই সুবিধা পাবেন, এবং অবশ্যই খরচ সাপেক্ষ। মনখারাপ করছেন? আগে জানা থাকলে ধারকর্জ করে আপনার কোন প্রিয়জনকে সেখানে নিয়ে যেতেন? তাহলে কাক্কেশ্বর কুচকুচের ভূমিকাটা আমাকেই নিতে হয়।

ক্যান্সার মানেই কি এক চিকিৎসা?

প্রথমেই বলি ক্যান্সার নানা প্রকারের। রামের ক্যান্সার শ্যামের থেকে আলাদা। যদু ও মধুর একই ক্যান্সার তবে তাদের গতিপ্রকৃতি আলাদা। কাজেই একই চিকিৎসা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার যে ক্যান্সার শরীরের নানা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে তা অপারেশন বা রেডিয়েশন-এর সাহায্যে নির্মূল করা যায় না। কেমোথেরাপি সব ধরনের ক্যান্সারকে কাবু করতে পারে না। কোন নির্দিষ্ট রোগীর চিকিৎসা নির্ভর করবে তাঁর ক্যান্সারের ধরণ, বিস্তার, পূর্বতন চিকিৎসার ইতিহাস, সম্ভাব্য চিকিৎসার লাভক্ষতির বিচার আর রোগীর চিকিৎসা সহ্য করার ক্ষমতার উপর। কাজেই শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন দেখে ভুলবেন না, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

ক্যান্সার চিকিৎসায় সাধারণত অপারেশন, রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি ব্যবহার হয়—এককভাবে অথবা যৌথভাবে। কোন কোন ক্যান্সার শুধুমাত্র রেডিয়েশন দিয়েই সারানো যায় তবে তার সংখ্যা নেহাতই কম।

রেডিওথেরাপি :

আমাদের দেশে যে সব ক্যান্সার সচরাচর দেখা যায় তার চিকিৎসার জন্য রেডিওথেরাপির এক বিশেষ ভূমিকা থাকে। সাধারণ রেডিওথেরাপি মেশিনের চোং হয় চৌকো আকারের, কিন্তু টিউমার তো জ্যামিতি বোঝে না তাই তার আকার হয় এলোমেলো, কিম্ভূত-কিমাকার। সেই বেঢপ টিউমার -এর চারদিকে সাবধানতার গণ্ডী মেপে যে নিশানা তৈরি হয় তাকে রেডিয়েশন বা রে দিয়ে 'সেঁকা' হয়। শরীরের মধ্যে টিউমার তো একঘরে নয়, তাকে ঘিরে থাকে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শরীরের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের কাজী তারা। টিউমারকে আঘাত করতে গেলে তার ব্যথা এদের বুকেও বাজে, এদের কাজে ক্ষতি হয়। কাজেই রেডিওথেরাপি করার এক প্রধান সমস্যা হল সুস্থ অঙ্গ বাঁচিয়ে টিউমারকে আঘাত করা। এই শ্যাম ও কূলের দোটানায় কখনো কখনো টিউমারকে যথেষ্ট পরিমাণে রে দেওয়া যায় না। তাই প্রচলন হল কনফরমাল রেডিয়েশন— যা দিয়ে টিউমারের মাপের রে দেওয়া যাবে, যেন দর্জি ডেকে খাপে খাপে ফিটিং আবরণ বানানো। এবার পুরোমাত্রায় রে দিয়ে তাক করলে শত্রু নিপাত হবে।

ফিটিং তো হল, কিন্তু এবার আরেক সমস্যা—টিউমার যে নড়েচড়ে! এর ফলে যে আঁটো-মাপের নিশানা তৈরি হয়েছিল টিউমার তার বাইরে সরে গেল আর মার পড়ল সুস্থ অঙ্গে। শত্রুর বীজ কিছু বেঁচে গেল, পরে সুযোগ পেলে আবার মাথা চাড়া দেবে। আর অকারণ রে পেয়ে কিছু সুস্থ অঙ্গহানি হল— দু'দিকেই লোকসান। তখন দুষ্টু টিউমারকে জব্দ করতে তাকে স্ট্যাচু করে দেওয়া হল, বানানো হল নট-নড়নচড়ন নট-কিচ্ছু খাঁচা, অর্থাৎ immobilization devices যার সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুটিকে সঠিক নিশানায় বাঁধা যাবে। বন্দি টিউমার তবুও অচঞ্চল হয় না— শ্বাসপ্রশ্বাসের সাথে ওঠে বসে, পড়শি অঙ্গের ধাক্কায় সরে বসে, নির্দিষ্ট গণ্ডীর সীমা পার হতে সময় লাগে না। ডাক্তারদের মাথায় হাত। নিশানা ছোট ও সঠিক মাপমতো বানাতে গিয়ে বড়ই বিপত্তি।

শত্রুকে মাপজোক :

ডাক্তার ও টিউমারের এই কুমির-ডাঙ্গা খেলা বন্ধ করতে সাহায্য করে দুটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অগ্রগতি—computerization ও imaging technology দ্বারা টিউমারের প্রতিটি পদক্ষেপ এখন ধরা পড়ছে মেশিনের কাছে। আধুনিক রেডিওথেরাপি মেশিনে আগে থেকেই জানানো থাকে ঠিক কোন স্থানে, কোন ভঙ্গিতে, কোন কোনা থেকে কতটা রে দিলে টিউমার বধ সাঙ্গ হবে। বিশেষজ্ঞরা মাপজোক করে হিসেব কষে প্ল্যান তৈরি করে মেশিনে ভরে দেন, মেশিন নির্দেশ মত মেপে মেপে রে দিয়ে টিউমার নাশ করে। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে প্রয়োজন এক আধুনিক লিনিয়ার অ্যাক্সেলেরেটার যে রশ্মি বা 'রে' দেবে, আর তার সাথে দরকার টিউমারের চালচলনের খোঁজ দেওয়ার কোনো ক্যামেরা বা স্ক্যানার। বিভিন্ন কোম্পানি নানা ভাবে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার উপযুক্ত মেশিন তৈরি করে বাজারে এনেছে, শুরু হয়েছে Image Guided Radiotherapy (IGRT), Stereotactic Radiosurgery / Radiotherapy (SRS/SRT), Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) ইত্যাদি। নামে ও কাজে তফাৎ থাকলেও এদের মূল উদ্দেশ্য একই। এটাও বলা প্রয়োজন যে এখনো পর্যন্ত এদের ফলাফলের কোন তফাৎ দেখা যায়নি—বিজ্ঞাপন যাই বলুক না কেন।

তাহলে সাইবার নাইফ? সাইবার নাইফ এমনই এক মেশিন যা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে, ছুরিকাঁচি না চালিয়ে, দক্ষতার সাথে সুস্থ অঙ্গ বাঁচিয়ে টিউমার বিনাশ করে। রোগীকে খাঁচায় না বেঁধে ক্যামেরা ও ঘুরন্ত মেশিনের সাহায্যে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করা যায়। যেহেতু নিশানায় শুধুই টিউমার থাকে, পুরোমাত্রায় রে দেওয়া সম্ভব হয়, সুস্থ অঙ্গের

সহনশক্তির সীমার কথা চিন্তা করতে হয় না। যেসব প্রত্যঙ্গে সাধারণভাবে রে দিলে প্রভূত ক্ষতি হয়, যেমন ফুসফুস বা যকৃত, সেখানে এই যন্ত্র খুবই ভালভাবে কাজ করবে। তাহলে আমাদের প্রিয়জনেরা কেন এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে?

এই চিকিৎসাপন্থা বিরল ও খরচসাপেক্ষ বটে, কিন্তু এর সবচেয়ে বড় অন্তরায় আমাদের রোগীদের টিউমারের গড়পড়তা আয়তন। পাখীর চোখের মতো নিশানার জন্য টিউমারকেও ওই পরিমাণ ছোট হতে হবে। টিউমার যদি ৩-৪ সেন্টিমিটারের চেয়ে বড় হয় তাহলে তাকে এই ভাবে নাশ করতে হলে অনেক বেশি সুস্থ অঙ্গহানি হবে— ফলে এর মূল উদ্দেশ্য সাধন হবে না। যে দেশে প্রায় ৩/৪ রোগীর টিউমার 'advanced stage' বলে গণ্য হয় সে দেশে সব হাসপাতালে এই মেশিন বসালে মজুরী পোষাবে না, অপচয়, অপব্যবহার হবে। এর চেয়ে উপযুক্ত সরঞ্জামের সঙ্গে লিনিয়ার এক্সেলেরেটার ব্যবহার করে লক্ষ্যভেদ করা যেতে পারে— তাতে ফল একইরকম হবে আর ওই একই মেশিনে বাকি রোগীদের সাধারণ চিকিৎসাও করা যাবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে সঠিক হাতিয়ার ব্যবহার করার সুযোগ থাকবে, অনেক বেশি সংখ্যক রোগীর উপকার হবে। আর যে রোগীর সাইবার নাইফ ছাড়া গতি নেই, তাকে অবশ্যই নিকটবর্তী কোন referral centre-এ পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আজকের এই বাজারি দুনিয়ায়, বিজ্ঞাপনের ভাষায় আর মুনাফার আশায় অনেক তথ্যই ধোঁয়াশায় মাখা। এই লেখা ইচ্ছা করেই অতিসরলীকৃত করা হল, যদি সাধারণ মানুষের কাজে লাগে তো ভাল লাগবে।

লেখক পরিচিতি : ডা. সুস্মিতা ঘোষাল এমবিবিএস, এমডি, চণ্ডীগড়ে পি জি আই এম ই আর-এ রেডিওথেরাপির অধ্যাপক। ডাক্তারি ছাত্র পড়ানো আর ক্যানসার নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি চলে তাঁর লেখা ও নানা বিষয়ে অজস্র পড়াশুনা।

ADVT

কম খরচে যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

চেঙ্গাইল-বেলতলা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

- সোম থেকে শনি সকাল ৮টা থেকে ১২টা জেনেরাল ক্লিনিক।
- বিশেষ ক্লিনিক : স্ত্রী রোগ, মনোরোগ, দন্তরোগ, চর্মরোগ, ফিজিকাল মেডিসিন ও ফিজিওথেরাপি, শল্য চিকিৎসা, চক্ষুরোগ।
- কম খরচে পরীক্ষা-নিরীক্ষা : প্যাথোলজি, এক্সরে, ইসিজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি।
- কম দামে যুক্তিসঙ্গত ওষুধের দোকান।

পরিচালনায় : শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

যোগাযোগ : ০৩৩-৬৪৫৩৮২১
ওয়েবসাইট : www.shramajibiswasthya.org.

তৃতীয়স্তর বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্যব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে তিনটি পর্বে বিভক্ত প্রবন্ধের এটি তৃতীয় পর্ব। আগের দুটি পর্বে আমরা দেখেছি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগ-প্রতিরোধকমূলক কাজ আর প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সারানোর কাজ—পরিকল্পনার স্তরে এ-দুয়ের একটা মেলবন্ধন আছে—যদিও সেই পরিকল্পনা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে গলদ অনেক। মধ্যম স্তরের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা, অর্থাৎ জেনারেল হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল আর জেলা হাসপাতাল—এদের ওপর রোগ-প্রতিরোধমূলক কাজের দায়িত্ব নেই, ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা মিউনিসিপ্যাল বা কর্পোরেশন হাসপাতালের হাতে ন্যস্ত, কিন্তু তাদের পরিকাঠামো অপ্রতুল। তাই রোগ প্রতিরোধের কাজটা মধ্যমস্তরে প্রায় হয়ই না, আর রোগ সারানোর কাজেও গলদ—গলদ পরিকল্পনাতে ও তার প্রয়োগে। সর্বত্র জনসংখ্যার তুলনায় স্বাস্থ্যব্যবস্থা-চিকিৎসাব্যবস্থা কম, সুতরাং লোকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বড় বড় শহরের গুটিকয় সর্বোচ্চ-স্তরের হাসপাতালে, যাদের অধিকাংশেই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। এই তৃতীয় স্তর বা সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল-হকিকত খুঁটিয়ে দেখছেন **ডা. অনিরুদ্ধ কর।**

আমাদের রাজ্যে সর্বোচ্চস্তরের স্বাস্থ্যপরিষেবা দেওয়া হয় মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ও কয়েকটি বিশেষ হাসপাতালে। এদেশে চিকিৎসা পরিষেবার প্রাথমিক সূত্রপাত ইংরাজরা করেছিল মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে। তার মূল কারণ ছিল বঙ্গদেশের গরম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সে-সময় দেশে নানা মহামারীর বর্ণনা শরৎচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র খুললেই পাওয়া যায়। তরুণ ব্রিটিশ নাগরিকরা যারা সুদূর ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানীর হয়ে বা পরে ইংল্যান্ডের রাজা-রাণীর হয়ে দেশ শাসন করার জন্য এদেশে আসত, তারা দেশটায় ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি রোগের ঘন ঘন প্রাদুর্ভাবে ভুগত। তাই তারা প্রথমে পিজি হাসপাতাল ও পরে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। নিবারণমূলক চিকিৎসার বা জনস্বাস্থ্যের কোন বিজ্ঞানসম্মত ধারণাই তখন ছিল না, যা ছিল তা হাইজিন বা স্যানিটারী ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারণার কিছু অঙ্কুর।

স্বাধীনতার পরে যখন দেশীয় সরকার হাসপাতাল তৈরীতে নামলেন তখন পুরাতন ব্রিটিশ পদ্ধতির ভারতীয়করণ হল কেবলমাত্র নামেই, কাজে পুরো হল না। রোগের মানচিত্র, পুষ্টির গুরুত্ব, উপার্জন বা সক্ষমতার প্রয়োজন এ সব ভাবা হল না। সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ও চিকিৎসা পাঠক্রমে আগে যা ছিল স্বাধীনতার পরেও তাই থাকল। ১৯৬০-৭০ সাল অবধি আমরা সবাই বিদেশী বই পড়ে ডাক্তার হয়েছি—ওদের দেশে যার গুরুত্ব বেশি তা আমরাও জোর দিয়ে পড়েছি। কিন্তু দেশীয় কোন তথ্যই ছিল না, আজও তেমন ভাবে এদেশী তথ্য উপলব্ধ নয়। ফলে সাপে কাটা, বিষ তেল খাওয়া বা পথ দুর্ঘটনায় যত লোকই পশ্চিমবাংলায় মারা যান না কেন, সর্বোচ্চ পর্যায়ে ও মেডিক্যাল কলেজগুলির পড়ানোতে গুরুত্ব পায় হৃদযন্ত্রের চিকিৎসা, ডায়ালিসিস ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও মধ্যমস্তরে পরিকাঠামোর যে কি হাল, মেডিক্যাল কলেজে পাঠরত ছাত্র ও চিকিৎসক

শহরের বুকে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ব'সে তা নিয়ে প্রায় কোনও ধারণাই করতে পারেন না। ডাক্তারি শিক্ষকবৃন্দও অত্যাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এত গুরুত্ব দেন যে এখন ব্লক-স্তরে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে।

যদিও আমরা জানি রোগীর ইতিহাস বিশদে জানা, পারিবারিক ও পেশার গুরুত্ব রোগের ক্ষেত্রে জানা কত জরুরী, কিন্তু তবু সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থাটাই দিন দিন মার্কিন বা বিদেশী ধাঁচে ভীষণ প্রকৌশল-নির্ভর হয়ে পড়ছে। Inspection, Palpation, Percussion ও Auscultation (অর্থাৎ রোগীকে ভালোভাবে পরীক্ষা) করে যে রোগের হদিশ করা যায়— তা কেউ এখন শেখান না, কেউ শিখতেও চান না। ফলত রোগীর ও পরিবারের অকারণ খরচ বাড়ে, ঝামেলা বাড়ে।

আমরা প্রসবজনিত মাতৃমৃত্যু কমাতে চাইছি, কিন্তু অধিকাংশ নবীন চিকিৎসক প্রসব করাতে ভয় পান। কারণ মেডিক্যাল কলেজে প্রশিক্ষণের সময় তাঁরা প্রসব করানো শেখেন নি, কেউ তাঁদের না-শেখার জন্য কিছু বলেও নি। তাই স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে জেলা হাসপাতাল এ-ওর ঘাড়ে প্রসবের সমস্যা ঠেলে দেয়, এবং শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত হয় মেডিক্যাল কলেজ। অথচ সমীক্ষায় দেখা যায় মেডিক্যাল কলেজে যত রোগী আসেন তার দুই তৃতীয়াংশ বা আরো বেশির তাঁর বাড়ির কাছেই পরিষেবা পেতে পারতেন বা পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না পাওয়ায়, আর বড় বড় বাড়ী, দামী দামী ডাক্তারবাবুদের কথা ভেবেও বটে, তাঁরাও সরাসরি চলে আসছেন মেডিক্যাল কলেজে। ফলে যাঁদের এখানে প্রকৃত চিকিৎসা পাওয়া উচিৎ তাঁরা বঞ্চিত হন ও মেডিক্যাল কলেজগুলি রোগীর চাপে হাঁসফাঁস করে।

প্রাইভেট বা কর্পোরেট-সেক্টর হাসপাতাল গুলিতে আপৎকালীন চিকিৎসা নেবার পরিকাঠামো অতি কম, যাও বা আছে তা দুর্মূল্য। ফলে সকলের গতি এই তৃতীয় পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল। অথচ সংকটকালীন চিকিৎসা (Critical care) এখানে পাঠ্যবিষয় নয়; বিশেষজ্ঞের অভাব আছে, আর

তাই এ বিষয়টি বড়ই উপেক্ষিত। চিকিৎসকরা আপৎকালীন অবস্থায় হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের পুনরুজ্জীবন করতে (CPR) জানবেন না— এটা ২০০০ পেরিয়ে ভাবাই যায় না, অথচ এখানে তাই হচ্ছে।

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে কম্যুনিটি মেডিসিন বলে একটি বিভাগ আছে, কিন্তু তাঁরা ক্লিনিক্যাল বিষয়ের সাথে যুক্ত নন। এমন কি জেলাগুলির মহামারী সংক্রমণ হলেও সবাই তাকিয়ে থাকেন আই ডি হাসপাতাল, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, বা নাইসেড (NICED) এর দিকে। বহু চেষ্টা করা হয়েছে জেলাগুলির সাথে কম্যুনিটি মেডিসিন বিভাগটিকে যুক্ত করার, কিন্তু আজও তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

এই রাজ্যে সরকারী হাসপাতালে জেলাস্তর অবধি কোন বায়োপ্সি হয় না, জীবাণু কালচার হয় না, ব্যতিক্রম থাকলে তা খুবই কম। জেলাস্তরে ক্যানসারের চিকিৎসা এমন কি কেমোথেরাপি দেওয়া যায় না, ক্যানসারের অপারেশন হয় না, প্রস্টেট অপারেশন হয় না। ছানি অপারেশনের আধুনিক যন্ত্র বা Phaco নেই। গ্লুকোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। এর ফলে এইসব রোগী বাধ্য হন বেসরকারি ব্যবস্থায় যেতে, রাজ্যের বাইরে চলে যেতে, কিংবা বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে ভীড় করতে।

গোটা পশ্চিমবাংলার মস্তিষ্কে আঘাত চিকিৎসার জন্য আছে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজি (BIN); তার আবার কোন আপৎকালীন ব্যবস্থা নেই। অনেক চেষ্টা করেও তা চালু করা যায়নি। যেমন চালু করা যায়নি জেলার ক্যানসার চিকিৎসাকেন্দ্র বা ট্রমা হাসপাতাল। বর্ধমান, আসানসোল, খড়্গপুর, আলিপুরদুয়ার, উলুবেড়িয়া— সর্বত্র নানাবিধ পরিকল্পনা পড়ে আছে বছরের পর বছর।

চাই যুগোপযোগী পরিবর্তন : আমাদের চিকিৎসা-শিক্ষণ পদ্ধতি, সিলেবাস ইত্যাদি যদি যুগোপযোগী না করা হয় তা হলে এই সর্বোচ্চ স্তরের চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষের আস্থা হারাবে। রোগীকে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার করার ব্যবস্থা যা তৈরী করা হয়েছে তা মানতে বাধ্য করা, আদর্শ চিকিৎসা প্রণালী (Standard treatment protocol) মানতে বাধ্য করা, জাতীয় স্তরে গৃহীত নির্দিষ্ট চিকিৎসা প্রণালী (National treatment protocol) — যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডায়েরিয়ার জন্য— সেসবগুলি মানতে বাধ্য করা দরকার ও সম্ভব, এবং এসবই প্রশাসনিক বিষয়। এবং এগুলি যদি সদর্থক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপে না থাকে তা হলে আমাদের মেডিক্যাল কলেজগুলি, যা ছিল আমাদের সকলের গর্বের বিষয় অন্তত ১৯৬০-৭০ সাল অবধি, তা ক্রমশ মানুষের আস্থা হারাবে। অথচ এখান থেকেই পাশ করেছেন রাজ্যের অধিকাংশ চিকিৎসক, সেবিকা ও টেকনিশিয়ান। কিন্তু পরিষেবার মান ও পরিকাঠামোর চিত্র কর্পোরেট হাসপাতালে একরকম ও মেডিক্যাল কলেজে অন্যরকম— এটা থাকবে কেন? অর্থের অভাব কোন সঙ্গত কারণ নয়। কি কারণে মেডিক্যাল এডুকেশন সার্ভিস-এ সরকারী

শিক্ষক-ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিষিদ্ধ করেও সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে হলো? কেন হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসানো থেকে সাধারণ রক্ত পরীক্ষা সর্বত্র কমিশন-কাটমানির গভীর দুর্নীতির প্রভাব ও প্রতাপ থাকবে? কে বা কারা এর জন্য দায়ী—সে জবাব নেবার সময় এসেছে, কারণ মানুষ এসব ভাল চোখে দেখেন না এবং চিকিৎসক সেবিকা বা টেকনিশিয়ান মাত্রই অসৎ নন। এই পরিস্থিতির বাইরে চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের বার করে আনবার জন্য আবার দরকার সঠিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইচ্ছা ও দক্ষতা। বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে অসাধ্য-সাধন করা যায়— তা লিভার ট্রান্সপ্ল্যান্ট হোক বা বুকে বেঁধা লোহার রড্ বের করা হোক। কিন্তু মূল প্রশাসনিক বিষয়টি পরিবর্তনের অপেক্ষায়।

মানসিক রোগীরা এই রাজ্যে অত্যন্ত অবহেলিত। তাঁদের যথাযথ মানবিক ও আধুনিক চিকিৎসা দরকার। জেলা বা মহকুমায় তার পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু এই রোগ দ্রুত বাড়ছে ও এর ফলে আত্মঘাতী হবার সংখ্যাও বাড়ছে।

গবেষণা মেডিক্যাল কলেজে আর একটি অবহেলিত বিষয়। গত ২০ বৎসরের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা এই রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে হয়নি— অন্তত তথ্য তাই বলে। গবেষণার জন্য যে পরিকাঠামোর দরকার ও যে মানসিকতার দরকার আজকের অর্থলোলুপতা ও সংকীর্ণ পেশাদারিত্ব তাতে থাবা বসাচ্ছে। এ বড় পরিতাপের বিষয়।

সমাজের অঙ্গ চিকিৎসাব্যবস্থা : স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকাটি যাঁরা পড়েন তাঁদের ধারণা আছে শহীদ হাসপাতাল কি ভাবে চলতে পারে। শ্রমজীবী হাসপাতাল যে ভাবে কঠিন অপারেশন কম খরচে করে থাকেন চিকিৎসক সমাজকে তা কেন উদ্বুদ্ধ করে না এটা ভাবার বিষয়। বিশ্বের সর্বত্র যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে তার জের এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় লেগেছে বৈকি। আর যাঁরা পরিচালক বা নীতি-নির্দ্ধারক তাঁরা এই সরকারী ব্যবস্থা এড়িয়ে চলেন। এখন হাসপাতালের সকল কর্মচারীই চান নিজেকে বা পরিবারের সকলকে বাইরের নার্সিংহোমে ভর্তি করতে। এম-এল-এ, এম-পি বা মন্ত্রীবর্গ—তাঁরাও সরকারী ব্যবস্থায় তেমন ভরসা রাখেন না। তা হলে সাধারণ মানুষ কী করবে? তাদের তো চিন, কিউবা বা আমেরিকা-ইংল্যান্ড যাবার অর্থ নেই। বাইপাসের ধারে বা শহরতলীতে যাঁরা জলের দরে হাসপাতাল করার জন্য জমি পেলেন সরকারী আনকুল্যে তাঁরাও গরীব রোগীদের কথা ভাবেন না— সেটা দেখারও কেউ নেই। এমনকি পাবলিক-প্রাইভেট- পার্টনারশিপ মডেলে যেসব এম-আর-আই, সিটি স্ক্যান ও অন্যান্য ডায়াগনোস্টিক ক্লিনিকগুলি হল তাদেরও একটা নির্দিষ্ট অংশ বিনামূল্যে পরিষেবা দেবার কথা— দেন না, দেখবার কেউ নেই।

মেডিক্যাল কলেজগুলির সঙ্গে স্বাস্থ্য-প্রশাসন ও জেলার যোগাযোগ আরো নিবিড় হওয়া উচিৎ। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা আশু প্রয়োজন। কিন্তু মেডিক্যাল রেকর্ড সেকশন এখানে ভীষণ অবহেলিত। তথ্যসমূহ কমপিউটারে নথিভুক্ত করা প্রায় নেই। ফলে তথ্যের অভাব।

দুর্নীতিও মেডিক্যাল কলেজগুলিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পড়া ছেলেমেয়েরা জেলাস্তর অবধি প্রশাসনে আছেন—কিন্তু তাঁরা সব করেন কী? মানবসম্পদ ব্যবহার, অর্থ-যন্ত্র-রসদের ব্যবহার অর্থাৎ Man management, Resources management — এসবে তাঁদের ভূমিকা কী? ওয়ার্ড-মাস্টার যাঁরা হাসপাতালের মেরুদন্ড তাঁদের নিয়োগ বন্ধ , কোনও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নেই। আমরা তুলনা করি কর্পোরেট হাসপাতালের সঙ্গে; সেখানে যা করা যায় এখানে তা সবকিছু করা যাবে না। কিন্তু কিছু অংশ তো কর্পোরেট হাসপাতালের মতো করে করা যায়; সত্যি কথা বলতে কি মুনাফার চাহিদা নেই বলে মানুষের জন্য আরও সহজ, 'ইউজার ফ্রেন্ডলি' করেই করা যায়। কিন্তু করা হচ্ছে না কিসের অভাবে? অভাব দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার, দূরদর্শী রাজনৈতিক সদিচ্ছার।

রোগী না-দেখে ডাক্তারি শেখা

আর একটি নতুন সর্বনাশ হোলো, হাউসস্টাফশিপ তুলে দেওয়া ও প্রশ্নোত্তরের বই মুখস্থ করে (M.C.Q পড়ে) পরবর্তী ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা যোগাড় করা। ফলে জুনিয়র ডাক্তারবৃন্দ, যারা হাসপাতালের পরিষেবার এক সর্ববৃহৎ অংশ, তারা ক্রমশ ডাক্তারী করা শিখছে না। ডিগ্রী-সর্বস্ব ডাক্তার হয়ে কোন লাভ নেই, কারণ এটা একটা বিশেষ পেশা ও তা 'skill-based'। এই skill বা দক্ষতা এক বছরে তৈরী হয় না। হাউসস্টাফ থেকে ঘসেমেজে উঠতে উঠতে কয়েক বছর পার হলে তারপর সত্যিকারের চিকিৎসক হওয়া যায়। আর বিশেষ শিক্ষার জন্য বিশেষ মানসিকতা লাগে। ফলে রাজ্যে এখন সার্জেনের আকাল, ভালো মেডিসিনের লোক পাওয়া যায় না। এমন কি চক্ষুরোগ বা নাক-কান-গলা এসব বিষয়েও আমরা দক্ষিণ ভারত বা পশ্চিমভারতের দিকে তাকিয়ে। ওদেশের নানা হাসপাতাল এই রাজ্যে প্রবেশ করছে, কিন্তু এই রাজ্যের হাসপাতাল অন্য রাজ্যে যেতে পারছে না। এই অসম প্রতিযোগিতা আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে এবং একমাত্র শিক্ষক-চিকিৎসকরাই পারেন এ অবস্থায় পথ বাতলাতে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে এখানে এ আই আই এম এস (A.I.I.M.S.) এর মতো হাসপাতাল তৈরি হলো না। আর জেলা-স্তরে যে নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলি খুলছে তার পূর্ণত্ব পেতে আরো অনেক বছর পেছিয়ে যাবে। চিকিৎসা ব্যবস্থা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ততদিনে আরো এগিয়ে যাবে, আমরা তাই পিছিয়েই থাকব।

আসুন, পথ খুঁজি : মুখে বলি 'রোগ সারানোর চাইতে রোগ হওয়া ঠেকানোই শ্রেয়', কিন্তু মানুষকে স্বাস্থ্য বিষয়ে শেখানো তেমন হয় না, এমনকি রোগীর বাড়ীর লোকের সঙ্গে নিয়মিত প্রতিষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ রাখা এখনো সেভাবে চালু হয়নি। পাড়ার পারিবারিক চিকিৎসক আর পাওয়া যায় না, পেলেও মানুষ তাঁর উপর ভরসা করেন না। এই সংকটময় সময়ে মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষকদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে। যদি তাঁরা আন্তরিকভাবে চান পশ্চিমবাংলায় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সুদিন ফিরিয়ে আনবেন, তাহলেই তা সম্ভব। তাঁদের যোগ্যতার অভাব নেই, কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা আছে কি? আশা করব দিন পালটাবে। পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসেবে সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

লেখক-পরিচিতি : ডা. অনিরুদ্ধ কর, জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যপ্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে কাজ করেছেন।

advt.

সাপ—সত্য কি? মিথ্যা কি?

সাপ নিয়ে কত না ভুল ধারণা আর গালগল্প ! সেগুলো মানুষের ক্ষতি করে, ক্ষতি করে সাপের, ক্ষতি করে আমাদের পরিবেশের। সত্যি কথাগুলো লিখছেন **ডা. মৃত্যুঞ্জয় সরকার।**

হিন্দুধর্মে সাপ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সাপ নাগ বলে পরিচিত। শিবের গলায় সাপ জড়ানো থাকে, না থাকলে সে মূর্তি যেন সম্পূর্ণ হয় না। বিষ্ণু সপ্তমাথা সাপের ওপর বসে থাকেন। তাই মানুষ সাপ পূজো করে, সাপকে নিয়ে নানারকমের উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সাপকে তুষ্ট রাখার জন্য মানুষ কতরকমভাবেই না চেষ্টা করে। অসংখ্য ভুল এবং ভ্রান্ত ধারণা আমাদেরকে এই সব জিনিষ করতে বাধ্য করে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই সব ধারণার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে — অজ্ঞতা, মূর্খতা, ভয়, ভীতি এবং অপপ্রচার। বিভিন্ন ধরনের সিনেমায় সাপকে নিয়ে যে ধরনের অবাস্তব ঘটনা দেখানো হয় তা মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এছাড়াও আছে সাপুড়েদের বলা নানা ধরনের মিথ্যা গল্প এবং ভুল তথ্য।

সাপ কি মনে রাখে?

ছোটবেলায় একটি সিনেমা দেখেছিলাম, খলনায়ক একজোড়া সাপের মধ্যে একটি সাপকে মেরে দেয়। সবাই তাকে ভয় দেখায় এই ব'লে— 'মৃত সাপের সঙ্গী তোমাকে খুঁজে বার করবে এবং প্রতিশোধ নেবে'। শেষ পর্যন্ত তাই হয়। মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে সাপ খুঁজে বার করে সেই খলনায়ককে; পরের পর ছোবল এবং মৃত্যু। দর্শকদের হাততালি এবং উল্লাস এবং একটি মিথ্যার প্রতিষ্ঠা। আসল কথাটা হল, সাপের এত বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি নেই। তাই এরা মনে রাখতে পারে না। তাছাড়াও সাপ প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রাণী নয়, তাই সঙ্গী মারা গেলে, যে বা যারা দায়ী তাদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

সাপ কি দুধ খায়?

গ্রাম বাংলায় কোন ভগ্নপ্রায় বাড়ির মধ্যে মানুষ দুধের বাটি রেখে আসে, সেটা খেয়ে সাপ খুশি থাকবে এই ধারণায়। অন্য কোন প্রাণী সেই দুধ খায় এবং প্রচার হয় কালকেউটে ওই দুধ খেয়েছে।

সাপ স্তন্যপায়ী প্রাণী নয়। তাই এরা দুধ খায় না। দুধ হজম করার মতো প্রয়োজনীয় উৎসেচক এদের শরীরে থাকে না। তাই দুধ খেলে সেই দুধ একটি স্তর সৃষ্টি করে পাকস্থলীতে জমে থাকবে, মানুষ কোনও প্লাস্টিকের বস্তু খেলে যেমন হবে। অনেক সময় প্রচন্ড তৃষ্ণার্ত হলে, কাছাকাছি জলের

সন্ধান না পেলে বাধ্য হয়ে দুধ খেতে পারে।

এরা গরুর স্তন থেকে দুধ খায় না। যে প্রচার আছে, সাপ গরুর স্তন থেকে দুধ খেয়ে গরুকে শুকনো করে দেয় এবং সেই গরুর মৃত্যু হয়, সে ধারণা ভুল।

সাপের শরীর হিমশীতল না গরম?

সাপের শরীর নাকি হিমশীতল। সবাই তাতে খুব ভয় পায়, বিভিন্ন সাহিত্যে এই হিমশীতলতা মানুষের চরিত্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সাপ নিজের শরীরে তাপ তৈরী করতে পারে না, তাই পরিবেশের তাপমাত্রা সাপের শরীরে প্রতিফলিত হয়। পরিবেশ ঠান্ডা হলে ঠান্ডা, গরম হলে গরম।

সাপ চোখ দিয়ে মানুষকে বশীভূত করে? তাড়া করে?

না, গল্পে আছে সাপ ফণা তুলে একভাবে তাকিয়ে থাকে মানুষের দিকে। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মানুষ বশীভূত (hypnotized) হয়ে নড়াচড়া করতে পারে না, তখন সাপ ছোবল দেয়। আসলে সাপের চোখের পাতা (eye-lid) থাকে না; তাই চোখের পলক পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। ফণা তুলে যখন তাকায় তখন মনে হয় একদৃষ্টে ভয়ঙ্কর ভাবে তাকিয়ে আছে (stare), তখন অনেকসময় ভয়ে মানুষটি চিন্তাশক্তি কমে যায়, সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে— যেন সাপের দৃষ্টিতে সম্মোহন ক্ষমতা আছে।

সাপ ভয় পেয়ে অনেক সময় দৌড়য়, তার সামনে মানুষ পড়লে স্বাভাবিকভাবেই সে সাপের সামনে জোরে দৌড়ে পালাতে থাকে—সাপ পেছনে দৌড়য় যেমন দৌড়চ্ছিল। সাপ দেখে না মানুষটির দৌড়, মানুষটি যে দিকে দৌড়ায়, ঘটনাচক্রে সাপটিও সেইদিকে দৌড়ায়। মানুষটি গ্রামে ফিরে ভুল করে বলে সাপ তাকে তাড়া করেছিল। সাপ হিংস্র প্রাণী নয়; তাই তারা সাধারণভাবে তাড়া করে না। তাছাড়া, মানুষকে তাড়া করে সাপের কোন লাভ হয় না।

বিষধর সাপ কামড়ালেই মৃত্যু :

না, চিকিৎসা সময়মতো না করলে শতকরা ৫০ জনের মৃত্যু হতে পারে। কারণ বিষধর সাপ কামড়ালেই সব সময় শরীরে বিষ ঢোকে না (dry bite) সাপ কতটা বিষ কামড়ের সাথে শরীরে ঢোকাবে (inject) সেটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মনে রাখতে হবে,সাপের বিষ মানুষ মারার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়নি। তারা জন্তু-জানোয়ারের শরীরে বিষ ঢুকিয়ে তাদেরকে নিস্তেজ করে, তারপর খেয়ে নেয়। তবে মনে রাখতে হবে বিষধর সাপ কামড়ালে সত্বর চিকিৎসা করতে হবে। **তন্ত্র-মন্ত্র এবং পূজায় বিষক্রিয়ার উপসর্গ এবং মৃত্যু রোধ করা যায় না।** এই সমস্ত জিনিসে বিশ্বাস করবেন না।

সাপের বিষদাঁত :

সাপুড়েরা সাপ ধরে তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেয়। তারা মনে করে, তখন ছোবল দিলেও শরীর বিষ ঢুকবে না। আসলে তা নয়, সাপের বিষদাঁত (fangs) ভেঙে যাওয়ার পর পুনরায় তৈরী তা হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই সেই সাপের কামড়ে মৃত্যুও হতে পারে। কিন্তু সাপুড়ের সাপ ধরার পর

সাধারণত তাকে এত কম খাবার দেয় যে সাপের কামড়ানোর ক্ষমতাটুকুও চলে যায়।

সাপ মানুষ গিলতে পারে?

না, পৃথিবীতে সব থেকে বড় সাপ অজগর এবং অ্যানাকোন্ডা, এরাও কখনও মানুষ গিলে নিতে পারে না।

সাপ নিজের বিষ মানবদেহ থেকে তুলে নিতে পারে?

আবার চলচ্চিত্র, ভুল করে সাপ নায়ককে কামড়ে দেয়। মৃতপ্রায় নায়কের কাছে নায়িকার কান্না এবং চোখের জলের ঝরণা। তখন সাপ আবার ফিরে আসে এবং নায়কের দেহের একই জায়গায় কামড় দেয়। নায়ক ধীরে ধীরে চোখ মেলে। অবিশ্বাস্য!! বিশ্বাস করার দরকারও নেই, কেননা এরকম সম্ভব নয়।

সাপ কি শুনতে পায়?

খুব কম, যদিও সম্পূর্ণ বধির নয়, আমরা যখন কথা বলি কাছাকাছি থাকলেও সাপ শুনতে পায় না, এমনকি, বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লেও সাপ সেই শব্দ বুঝতে পারে না। তাই সাপুড়েরা যখন বাঁশি বাজায় সাপ তা শুনতে পায় না। তারা সাপুড়ের বাঁশির নড়াচড়া এবং শরীরের দোলা অনুভব করে এবং সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। আগেই বলেছি, কম খাবার দেওয়ার ফলে এরা দুর্বল হয়ে থাকে এবং ছোবল দিতে পারে না।

শেষে

সাপ আমাদের পরিবেশতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এরা মানুষের শত্রু নয়। দিনের পর দিন এই প্রজাতি বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে মানুষ বোধ হয় সব থেকে বেশি ভয় পায় সাপকে। একই সঙ্গে এটাও সত্য যে আমরা সাপকে সবথেকে বেশি ভুল বুঝি। সাপকে ভালবাসুন। সাপের থেকে দূরে থাকুন, সাপকে চলে যেতে দিন।

লেখক পরিচিতি : ডা. মৃত্যুঞ্জয় সরকার, এমবিবিএস, এমডি, একটি সরকারি হাসপাতালে মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত।

ব্যথার মলম লাগানো অযৌক্তিক। প্রয়োজনে ব্যথা কমানোর ওষুধ খেতে হবে।

advt.

Glenmark

Leading Integrated Research Based
Global Pharmaceutical Company

- Out-licensing GBR 500, the monoclonal antibody in a landmark deal
- First novel biologics out-licensing deal from an Indian company

Gracewell
Dermatology is within us

Offering you advanced therapeutic options in Dermatology

‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস’ - কী ও কেন? (চতুর্থ পর্ব)

‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ (Evidence-Based Medicine বা EBM) নিয়ে এদেশের অনেক ডাক্তারেরাও এখনও কিঞ্চিৎ ধন্ধে আছেন। তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। পাশ্চাত্য তথা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা তো মনগড়া কিছু ব্যাপার নয়, তা ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ’-এর ওপর ভিত্তি করেই রচিত। হঠাৎ করে বিংশ শতকের একদম শেষের দিকে যখন ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ তথা EBM নামটি জার্নালে-সেমিনারে আসতে থাকল, অনেকেই ভাবলেন - এ আবার নতুন কি? তারপরে যখন ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস (Evidence-Based Practice বা EBP) এল তখনও অনেকেরই মনে হল, এও বোধহয় নতুন বোতলে পুরনো মদ। যে বিষয়টি ডাক্তারদেরও অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেল তা হল, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণকে বহুদিন যাবত খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকলেও, বিভিন্ন ধরনের সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে কোনটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, কোনটার ওপর কতখানি ভরসা করা যায়— এই ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কার ছিল না। এমনকি কোনও ডাক্তার যদি মনে করতেন, তাঁর রোগীকে সবচেয়ে প্রমাণিত চিকিৎসাপ্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন, তাঁর পক্ষে সেই চিকিৎসাপ্রণালীটি খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব ছিল। তাই বিভিন্ন সময়ে অনেক অকেজো বা কম ভাল চিকিৎসা চালু হয়ে উঠেছিল।

*যেসব বড় বড় হাসপাতাল আর গবেষণাগারের দিকপাল চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের হাত ধরে আধুনিক ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির চিকিৎসকেরা অগ্রগণ্য, আর তাঁরাই আজ থেকে বছর কুড়ি আগে প্রথম ‘সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিন’ এই শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন, আর সেটার সংজ্ঞা দেন। সেই ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির ডাক্তার **তাপস মণ্ডল** ও ছাত্র **চেতন গোহাল** স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র পাঠকদের জন্য কলম ধরেছেন। এবারে তাঁদের লেখার চতুর্থ ও শেষ পর্ব।*

(আগে যা পড়েছি: স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র বিগত তিনটি সংখ্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর, অক্টোবর-নভেম্বর, ডিসেম্বর-জানুয়ারি ২০১২-২০১৩) আমরা লিখেছি যে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ঠিক করতে চিকিৎসক-গবেষকদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র সেই গোষ্ঠির বিজ্ঞান যাদের সিদ্ধান্ত নিষ্পত্তিকর (Deterministic) না হয়ে কেবলমাত্র সম্ভাবনাসূচক (Probabilistic), অর্থাৎ একই চিকিৎসা সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাল ফল দেয়না। সুতরাং কয়েকটি পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতিতে ওষুধ ইত্যাদির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করতে হয়। গবেষকরা অনেক রোগীর ওপর একটি নতুন ওষুধ প্রয়োগ করে দেখেন তা অন্য ওষুধের তুলনায় ভাল কিনা। অনেক রোগ এমনি-এমনি, বা চিকিৎসার প্ল্যাসিবো এফেক্ট তথা ‘রোগীতোষ ক্রিয়া’র ফলে ভাল হয়ে যায়, তাই ভুল করার সম্ভাবনা এড়াতে নানা যথোপযুক্ত পরিসংখ্যানশাস্ত্র-সম্মত পদ্ধতিতে ওষুধ বা যেকোনো রোগ-নির্ণয় ও রোগ-নিরাময় প্রযুক্তিকে যাচাই করা হয়।

সত্যিকারের ভাল চিকিৎসা, বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে। যে চিকিৎসা কাজে লাগে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি, তাকে বিদায় করা হয়েছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের তিনটি অংশ- চিকিৎসকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা, যে রোগীকে তিনি দেখছেন তার বাইরে নথিভুক্ত সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য-প্রমাণ, এবং রোগীর নিজের মূল্যবোধ ও চাহিদা। অনেকে ভুল করে ভাবেন যে সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বদলে কেবল পুঁথি ঘেঁটে দেখে — কিন্তু আসলে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবে অভিজ্ঞতাকে পুঁথি-জার্নালে প্রকাশিত সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্রমাণের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল রোগীর মূল্যবোধ ও চাহিদা। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসে নথিভুক্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করে চিকিৎসক রোগীকে সম্ভাব্য উপকার ও ঝুঁকির কথা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ‘শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য’—বিভিন্ন চিকিৎসার প্রণালী ও তাদের সাফল্য ও বিফলতা সম্পর্কে তথ্য একসাথে এনে তাদের বিশ্লেষণ করা, গুরুত্ব ও নির্ভরযোগ্যতা অনুসারে তথ্য সাজানো, এবং তার সাহায্যে চিকিৎসককে ঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যোগানো। কমপিউটারে ইন্টারনেটের সাহায্যে ও বহুযত্নপ্রসূত পরিকল্পনার দ্বারা এটা করা সম্ভব হয়েছে।

সব চাইতে নির্ভরযোগ্য ‘শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য’ হল ‘কোক্রেন-এর সিস্টেম্যাটিক রিভিউ / তথ্যভাণ্ডার’ — তা বর্তমানে আয়তনে ছোটো, কিন্তু বেশি নির্ভরযোগ্য, এবং একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর পাবার সম্ভাবনাও এখানে বেশি। সেখানে জানার বিষয়টি খুঁজে না পাওয়া গেলে আমাদের ‘সমালোচনা-সহ বিষয়’ (সাক্ষ্য-প্রমাণ গঠন ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নিয়মগুচ্ছ), ‘সমালোচনা-সহ প্রবন্ধাবলী’ (প্রবন্ধ সারসংকলন), ‘র‍্যান্ডমাইসড কন্ট্রোলড ট্রায়াল (আর সি টি)’, ‘কোহর্ট গবেষণা’, ‘কেস-কন্ট্রোল গবেষণা’, ইত্যাদি পরপর খুঁজে যেতে হবে। পরের দিকের সূত্রগুলির নির্ভরযোগ্যতা ও কার্যকারিতা ক্রমশ কমতে থাকে। জার্নালে প্রকাশিত সাধারণ প্রবন্ধ কম গুরুত্বপূর্ণ, কেননা সেখানে প্রচুর বাছাই না-করা তথ্য থাকে, আর প্রবন্ধ-পাঠককেই ঠিক করতে হয় সেই প্রবন্ধের সঙ্গে তাঁর বর্তমান সমস্যার যোগসূত্র কতটা, নির্ভরযোগ্যতাই বা কতটা)।

অস্টিন ব্র্যাডফোর্ড হিল বা রিচার্ড ডল নাইটহুড পেয়েছেন বটে, তবে এদেশে খুব বেশি লোক তাঁদের নাম শোনেনি। ‘সিগারেট মেরে ফেলে’ এই কথাটা যে কোনোদিন সিগারেট কোম্পানিগুলো তাদের নিজের খরচে সিগারেট প্যাকেটে লিখতে বাধ্য হবে সেটা ব্র্যাডফোর্ড হিল-রিচার্ড ডল এই দুই ইংরেজ জুটি না বাঁধলে কবে যে হতো, বা আদৌ হতো কিনা, বলা সন্দেহ। কিন্তু সে-গল্পটা গোড়া থেকে শোনা দরকার।

ব্র্যাডফোর্ড হিল-এর বাবা ছিলেন ডাক্তার, ব্র্যাডফোর্ডও ডাক্তারই হতে চেয়েছিলেন। বাদ সাধল তাঁর টিবিরোগ। সে-সময়ে টিবি হলে কেরিয়ারের অনেক দরজাই বন্ধ হয়ে যেত; হিল-কে ডাক্তারিতে ভর্তি করা গেল না। তিনি গণিত নিয়ে পড়াশুনো শুরু করলেন। আর রিচার্ড ডল-এর ইচ্ছে ছিল গণিত পড়া, কিন্তু কলেজে ঢোকার পরীক্ষার আগের রাত্রে অল্প একটু মদ্যপান করে তিনি এমনই বেসামাল হয়ে গেলেন যে চান্স পেলেন না, অগত্যা ডাক্তারি পড়া শুরু করলেন।

ব্র্যাডফোর্ড হিল ডাক্তার না হয়ে অঙ্ক কষার লাইনে গেলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রেমকে হায় কে ভুলিতে পারে? তিনি স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তার ওপরে গবেষণা শুরু করলেন। ১৯৪০ সালে তিনি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিকদের 'ডেথ সার্টিফিকেট' পরীক্ষা করে অঙ্ক কষে দেখালেন, আর্সেনিক নিয়ে কাজ করলে ক্যানসার হতে পারে। তারপর তিনি শিশুরোগের তথ্য পরিসংখ্যানবিদ্যা-সম্মতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখালেন, বাচ্চা যখন মায়ের পেটে তখন মায়ের 'রুবেলা' (বা জার্মান হাম) রোগ হলে বাচ্চার নানা জন্মগত ত্রুটি হতে পারে। আর তাঁর ডাক্তার হবার আশায় বাদ সেধেছিল যে টিবিরোগ, সেই টিবির চিকিৎসায় নানা অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতার পরিসংখ্যান নিয়ে গবেষণা করলেন। এইসব করে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে তথ্য ও পরিসংখ্যানবিদ্যার ভূমিকা সম্পর্কে যখন খুব দক্ষ গবেষক হয়ে উঠেছেন তখন, ১৯৪৮ সাল নাগাদ, তাঁর মনে হল ফুসফুসের ক্যানসার গত কুড়ি বছরে ছ'গুণ বেড়েছে — কেন তা এত বাড়ছে সেটা দেখা খুব দরকার। এর অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। কেউ বলছিলেন রোগ আসলে বাড়েনি, আগের চাইতে ভাল রোগনির্ণয় হচ্ছে বলে ওরকম মনে হচ্ছে। কেউ বলছিলেন রোগ বাড়ার পিছনে আছে শিল্পদূষণ বা মোটরগাড়ির ধোঁয়া বা সিগারেট।

ব্র্যাডফোর্ড হিল জোট বাঁধলেন ডাক্তার রিচার্ড ডল-এর সঙ্গে— ডাক্তার ডল করেন ডাক্তারি, কিন্তু তিনিও তাঁর পুরনো গণিত-প্রেম ছাড়েননি। তাঁরা ঠিক করলেন ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুস ক্যানসারের সম্পর্ক আছে কিনা দেখবেন। এতদিন ধরে যেভাবে গবেষণা তাঁরা করেছেন তার সঙ্গে এটার মৌলিক পার্থক্য হল, পুরনো রেকর্ড ঘেঁটে পরিসংখ্যান বের করে, কিংবা অন্য কারও গবেষণার তথ্য ব্যবহার করে, এখানে সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। এবং আর সি টি (Randomized Controlled Trial) করার প্রশ্নই নেই — সেক্ষেত্রে অনেক মানুষ, ধরুন ২০০ জন মানুষকে বেছে, তাঁদের র‍্যান্ডমভাবে দু'দলে ভাগ করে, ১০০ জনকে কয়েকবছর ধরে নিয়মিত সিগারেট খাওয়ানো আর অন্য ১০০ জনকে

সিগারেট না-খাওয়া সুনিশ্চিত করে তাঁদের দু'দলের ওপর নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে—এটা এক অবাস্তব ব্যাপার।

যে ধরনের পরীক্ষা তাঁদের কাজে লাগবে সেটা তাঁরা বুঝে নিলেন — সেটার পোষাকি নাম হল 'জনগোষ্ঠির ভবিষ্যৎ-অবস্থান নিরীক্ষা' (Prospective Cohort Study)। শুনতে ব্যাপারটা খটোমটো, কিন্তু মূল আইডিয়াটা খুব কঠিন কিছু নয়। দু'দল সুস্থ মানুষ বেছে নেওয়া হবে, আর এই দুই দল মানুষের মধ্যে সব ব্যাপারে মিল থাকবে। অমিল থাকবে শুধু একটা ব্যাপারে, সেটা হল যে 'ঝুঁকি'-টি নিয়ে নিরীক্ষা করা হচ্ছে, সেই 'ঝুঁকি' একটি দলের সবার থাকবে, এবং অন্য দলটির কারও থাকবে না। সোজা কথায়, দুই দল মানুষের মধ্যে একদল হবেন সিগারেটখোর, আরেকদল সিগারেট একেবারে ছোঁননা। তাঁদের ওপর কয়েকবছর ধরে নজরদারি চালিয়ে যেতে হবে। ব্যাপারটা সহজ নয়। প্রথমত, দু'দলের একদলকে ঘোরতর সিগারেট-আসক্ত হতে হবে, আরেক দলকে হতে হবে ঘোরতর সিগারেট-বিরোধী, কেননা নিরীক্ষা শুরু করার পরে বেশ কয়েক বছরের মধ্যে যদি কেউ দল-বদল করেন তো ফলাফল গুলিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ- কারীদের সকলকে বেশ নির্ভরযোগ্য হতে হবে, কেননা তাঁদের নিজেদের স্বাস্থ্য, রোগ ও সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ সম্পর্কে কয়েকবছর ধরে নিয়মিত সঠিক তথ্য পাঠাতে হবে। তৃতীয়ত, যেহেতু অংশগ্রহণকারীদের র‍্যান্ডামভাবে দু'দলে ভাগ করা সম্ভব নয়, তাই তাঁদের মোটের ওপর একই আর্থ-সামাজিক অবস্থান থেকে আসা দরকার। চতুর্থত, এই ধরনের নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যতটা সম্ভব বেশি হওয়া দরকার, কয়েক হাজার হলে ভালো হয়।

এইরকম কঠিন প্রাকশর্ত পূরণ করা বোধহয় সম্ভব নয় ভেবে যখন তাঁরা সিগারেট আর ক্যানসারের সম্পর্ক নিয়ে 'জনগোষ্ঠির ভবিষ্যৎ-অবস্থান নিরীক্ষা' করার আশা প্রায় ত্যাগই করেছেন, ঠিক তখন ব্র্যাডফোর্ড হিলের মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল। আরে, ডাক্তারেরা তো নিজেরাই এই নিরীক্ষার অতি উত্তম গিনিপিগ! অনেক ডাক্তারই এই ব্যাপারে কৌতূহলী, তাঁরা অংশগ্রহণে রাজি হবেন। তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান মোটের ওপর কাছাকাছি, আর নিজেদের স্বাস্থ্য ও ধূমপান সম্পর্কে সবথেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য তাঁরা নিজেরাই দিতে পারবেন। সুতরাং ১৯৫১ সালে ধূমপান আর ফুসফুস ক্যানসারের সম্পর্ক নিয়ে নিরীক্ষা শুরু হল, তিরিশ হাজার ব্রিটিশ ডাক্তার তাতে অংশগ্রহণ করলেন। এখন শুনলে অবাক লাগবে যে প্রথমে ধরে নেওয়া হয়েছিল এই নিরীক্ষা পঞ্চাশ বছর ধরে চলবে। তখন কেউ আন্দাজ করতে পারেননি সিগারেট ও ফুসফুস-ক্যানসারের যোগসূত্র এমন ঘনিষ্ঠ যে মাত্র তিন বছর পরে ১৯৫৪ সালেই এই 'ব্রিটিশ ডক্টরস স্টাডি'-তে (এই নামেই পরে এই নিরীক্ষাটি বিশ্ববিখ্যাত হয়) দেখা যাবে--- অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাঁইত্রিশজন ফুসফুস-ক্যানসারে মারা গেছেন, আর তাঁদের প্রত্যেকে ধূমপায়ী। শুধু ফুসফুস-ক্যানসার নয়, ধূমপায়ীদের হার্ট অ্যাটাক জাতীয় আরও কিছু মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে বেশ কয়েকগুণ। এরকম ফলাফল এতটাই অভাবিত ছিল যে অনেক গবেষক ভাবলেন নিশ্চয়ই বড়মাপের গোলযোগ আছে কোথাও। আর সিগারেট কোম্পানিগুলোতো এই ফলাফলকে একেবারে পাত্তাই দিল না। তাদের হাতে প্রভূত অর্থ ও ক্ষমতা, সুতরাং 'ব্রিটিশ ডক্টরস স্টাডি' ও ব্র্যাডফোর্ড হিল-রিচার্ড ডলকে তারা উড়িয়ে দেবার চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি। এই নিরীক্ষাটি যদি একটিমাত্র এধরনের গবেষণা হতো তো তাকে উড়িয়েই দেওয়া হত। কিন্তু ওই নিরীক্ষার পথ ধরে আমেরিকায় ১,৯০,০০০ মানুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে ১৯৫৪ সালেই দেখা গেল ধূমপান সত্যিই ওরকম মারাত্মক। অন্যদিকে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেল ইঁদুরের চামড়ার ওপরে সিগারেটের ধোঁয়া থেকে নিষ্কাশিত তরল লাগিয়ে রাখলে সেখানে ক্যানসার হচ্ছে— অর্থাৎ সিগারেটে

ক্যানসার তৈরীর কিছু উপাদান রয়েছে। আবার হিল-ডলের 'ব্রিটিশ ডক্টরস স্টাডি'-র প্রস্তাবিত পঞ্চাশ বছর পার হবার ঢের আগেই দেখা গেল ধূমপায়ী ডাক্তারদের শতকরা ৪৩ জন ৩৫ বছর থেকে ৬৯ বছর বয়সের মধ্যে মারা যান, আর অ-ধূমপায়ী ডাক্তাররা ঐ বয়সে মারা যান শতকরা মাত্র ১৫ জন। ডাক্তার ডল নিজেই তাঁর স্টাডির ফল দেখে বিস্ময়ে হতবাক।

সিগারেট কোম্পানিগুলো এই ফলাফলকে নাকচ করার চেষ্টা কম করেনি। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা ধূমপানের কুফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। শেষ অবধি জনমতের চাপে সরকারও নড়ে বসেছে, সিগারেট কোম্পানি-গুলো তাদের নিজের পয়সায় প্যাকেটের গায়ে 'সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' থেকে— 'সিগারেট ক্যানসারের কারণ', তারপর একেবারে সরাসরি–. 'সিগারেট মেরে ফেলে' এসবই লিখতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটা হল, সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস সত্যিকে বের করে আনে, আর সেই সত্যিটাকে কাজে লাগালে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনা সম্ভব।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের প্রভাব (সুনির্দিষ্ট উদাহরণ)

চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস আসায় নানাধরনের রোগের চিকিৎসায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। 'বাইরের সাক্ষ্য'-এর ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করে সুনির্দিষ্ট রোগে আগের চাইতে ভাল চিকিৎসা হচ্ছে। হার্ট ফেলিওর-এর চিকিৎসা এমন একটি জায়গা যেখানে এই উন্নতির ফলে রোগী বেঁচে যাচ্ছেন। এটা পঞ্জীকৃত সত্য যে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (হার্ট অ্যাটাক)-এ মৃত্যুর হার আগের চাইতে ২০ ভাগ-এর বেশি কমেছে; ১৯৬০-এর দশকে মৃত্যুহার ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, ২০০৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬ ভাগ *(এটা কানাডার তথ্য, আমাদের দেশে মৃত্যুহার অন্যরকম। সম্পাদক, স্বাস্থ্যের বৃত্তে)*। আগেকার সাফল্যের ওপর ভিত্তি করে যে নতুন চিকিৎসার ধরন তার ফলে এই উন্নতি। অতীতের থেকে সাক্ষ্য নিয়ে বর্তমানের চিকিৎসায় উন্নতি ঘটানো সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস বা সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক মেডিসিনের ধারণার স্তম্ভস্বরূপ। আগেকার সব কেস ঘেঁটে বোঝা গেল, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু প্রধানত হয় তার ফলে শারীরিক যে 'শক' হয় তার থেকে, প্রত্যক্ষভাবে হার্ট অ্যাটাক থেকে নয়। সুতরাং হার্ট অ্যাটাক রোগীর তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করে তাঁর 'শক'-এর চক্রে পড়া থেকে আটকানোটাই প্রাথমিক। সেইজন্য কিছু টেকনিক, যেমন ইনটেন্সিভ কেয়ার ট্রিটমেন্ট, থ্রম্বোলাইসিস, থ্রম্বোসিস আটকানোর চিকিৎসা এবং করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি— এসব করে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব

হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এক এক রোগী এক-এক রকমের, সুতরাং বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা করে চিকিৎসকের যে অভিজ্ঞতা হয় সেটা সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের অতি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোগীর বিভিন্ন দশায় কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা দিতে হবে চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা সেটা ঠিক করে দেয়। যেমন অ্যাঞ্জিওটেনসিন-কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর বলে যে ওষুধ আছে সেটা এখন হার্ট ফেলিওর রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেটা হয় কেবল সেইসব রোগীর ক্ষেত্রে যাঁদের হৃদপিন্ডের বাম নিলয়ের রোগের জন্য হার্ট ফেলিওর হচ্ছে। 'বাইরের সাক্ষ্য' এইভাবে ক্রমাগত ব্যবহার হতে হতে, আর সেটার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে, পরবর্তীকালে সব রোগীর জন্য তথ্যভান্ডার আরও বেড়ে যাচ্ছে, আর এভাবেই সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের কার্যকারিতা ও ক্ষমতা বাড়ছে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের ধারণা অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে আর তা খুব চট করে ব্যবহার করার ব্যাপারে চিকিৎসকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক সহজেই ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেওয়া ও তার অতি-ব্যবহার জীবাণুদের ক্রমে আরো বেশি করে অ্যান্টিবায়োটিক -প্রতিরোধী করে তুলছে, আর এই অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণু সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। অণুজীবরা বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকে অভিযোজন ক্ষমতা অর্জনের ফলে আরও বেশি স্থায়ী ও ভয়ানক সংক্রমণ হচ্ছে, আর তার জন্য নতুন চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেই হচ্ছে। নতুন অ্যান্টিবায়োটিকেও তারা প্রতিরোধী হয়ে উঠছে, সুতরাং একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে আর অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণু খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস এটাকে আটকাতে পারে, এবং বিগত কয়েক বছর ধরে সেটাই করা হচ্ছে। একদম নির্ভুল আর আধুনিকতম সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে রোগ নির্ধারণ আরও সুনির্দিষ্ট হচ্ছে, ফলে অকারণে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবস্থাপত্র ও ব্যবহার কমছে। অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণু সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার ও চিকিৎসকদের চটপট অ্যান্টিবায়োটিক লেখার প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে, ফলে এ-ব্যাপারে প্রচেষ্টা নেবার গুরুত্ব আরও বেশি বোঝা যাচ্ছে। ফলে ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবস্থাপত্র লেখা যথেষ্ট কমেছে (Finkelstein, 2003)। কমার কারণ হল আরও সুনির্দিষ্ট রোগনির্ধারণ আর অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবস্থাপত্র কোন পর্যায়ে লেখা হবে তার নিম্নসীমা বাড়ানো। ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হওয়া ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার করেই কেবল এদুটো কাজ করা গেছে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস চিকিৎসক -সমাজের একচেটিয়া সম্পদ নয়। সমস্ত গবেষণায় একে কাজে লাগানো যায়, নীতি-নির্ধারণে এই পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস কাজে লাগানোর অন্য একটা বড় ক্ষেত্র হল শিক্ষাব্যবস্থা। যে র‍্যান্ডমাইজড পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত প্রকৌশল তৈরি করা হয় ঠিক সেরকম পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ করা যেতে পারে (Slavin, Prondzinaky 2002)। সাক্ষ্য-প্রমাণ ও পরীক্ষার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের যে অবিশ্বাস্য গতিতে উন্নতি হচ্ছে সেটা শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এধরণের পদ্ধতি প্রয়োগ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে (Slavin, 2002)। শিক্ষাব্যবস্থার গবেষণার উদ্দেশ্য হল এমন পদক্ষেপ-সমূহ তৈরি করা যা ছাত্রদের ফল ভাল করতে সাহায্য করবে

ও সবচেয়ে ভাল শিক্ষণপদ্ধতি কি হতে পারে তা ঠিক করবে। সাক্ষ্য- প্রমাণ-ভিত্তিক পদ্ধতির সাফল্য শিক্ষাজগতের নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আশা করা যায় এব্যাপারে গবেষণার জন্য টাকা ও সুযোগ পাওয়া তত সহজ হয়ে উঠবে, আর তাতে এই প্রবণতা আরও বেগবান হয়ে উঠবে।

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের সীমাবদ্ধতা

বহু সুবিধা সত্ত্বেও সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের কিছু সীমাবদ্ধতা তো আছেই, আর সেগুলোর জন্যই একে পুরো কাজে লাগানো যাচ্ছে না, বিশেষ করে চিকিৎসার ক্ষেত্রে। প্রথম সমস্যা হল, একবার একটা চিকিৎসা বা ওষুধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, তা অকার্যকর প্রমাণিত হলেও ডাক্তারেরা তাকে ছাড়তে পারছেন না। অনুরূপভাবে, রোগীরাও ওষুধের দ্রুত পরিবর্তন প্রতিরোধ করেন। এসব কারণে সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস পুরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে না, আর তার ফলে এই পদ্ধতিটি সর্বত্র কাজে লাগানোর মতো সত্যিকারের কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিকশিত হতে দেরী হচ্ছে। আসলে আমরা অনেকসময়ে নতুন তথ্য নিয়ে ঠিক কি করব, কেমন করে তা কাজে লাগাব, তা বুঝে উঠতে পারি না। উপরন্তু, সমস্ত ডাক্তার জানেন না কি করে 'শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য' আহরণ করতে হয়, আর সেটা কাজে লাগবে কিনা তা ঠিক করতে হয়। তাই সমস্ত ডাক্তার ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস সম্পর্কে যত বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তত বেশি চিকিৎসক সমাজে এই প্র্যাকটিস ব্যবহৃত ও গৃহীত হবে। তখন সাক্ষ্য-প্রমাণের খোঁজ আরও সহজে মিলবে, এবং শেষতম জ্ঞানের নির্যাসটিকে অনেক বিশ্লেষণক্ষম তথ্যভান্ডারে ধরে রাখা যাবে।

সিদ্ধান্ত

সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস সম্পর্কে উৎসাহ বাড়ছে, কেননা গবেষণায় সব ক্ষেত্রে তা মূল্যবান প্রমাণিত হচ্ছে। বিশেষ করে চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অতি দ্রুতগতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়েছে। এটি যত বেশি করে গৃহীত হবে ও সবাই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন, এর কার্যকারিতা তত বাড়বে। 'ব্যক্তিগত দক্ষতা', 'শ্রেষ্ঠ বাইরের সাক্ষ্য', এবং রোগীর মূল্যবোধ ও চাহিদা - এর সবগুলো বিচার করে তবেই চিকিৎসক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা করতে পারেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের এই তিনটি অঙ্গই বিচার ও ব্যবহার করতে হবে, নইলে 'এতে অভিজ্ঞতার স্থান নেই'-এই বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা বাড়বে। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের পাঁচটি ধাপ আবার গবেষণা যাতে কার্যকরভাবে ও সুনির্দিষ্ট পথে চলতে পারে তা সুনিশ্চিত করে, আর তার ফলে দরকারি আবিষ্কারগুলি আরেকটু তাড়াতাড়ি হয়। বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন ওঠা, দরকারি সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্রুত যোগাড় ও বিশ্লেষণ করা, আর শেষে গবেষণার ফল কাজে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আবিষ্কার করার পথ সুগম হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিসের সুফল লিপিবদ্ধ করা আছে। যেমন আমরা একটু আগেই দেখেছি, হার্ট ফেলিওর-এর চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'বাইরের সাক্ষ্য'-এর ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসার উন্নতি হয়েছে এবং ফলে রোগী বেঁচে যাচ্ছেন। আমরা আরও দেখেছি, অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী জীবাণু সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ চিকিৎসকদের অ্যান্টিবায়োটিক লেখার অতি-প্রবণতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করার পরে তাঁরা এখন ব্যবস্থাপত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কম লিখছেন, ও তার ফলে জীবাণুদের অ্যান্টিবায়োটিক -প্রতিরোধী হয়ে ওঠা আগের চেয়ে কমেছে। এইভাবে 'বাইরের সাক্ষ্য' প্রতিষ্ঠা করার পর, শ্রমসাধ্য গবেষণা করে কোন বিশেষ পদক্ষেপ সবচেয়ে বেশি উপকারী—সেটা দেখে নীতি-নির্ধারণ করা যেতে পারে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবহারের ফলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবার দরকার হয় না। সাক্ষ্য-প্রমাণ-ভিত্তিক প্র্যাকটিস একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে স্থান দেয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে এর ব্যবহার গবেষণার পরস্পর-সাযুজ্য ও কার্যকর প্র্যাকটিসকে সম্ভব করে।

লেখক পরিচিতি : চেতন গোহাল কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির হেলথ সায়েন্স-এর ছাত্র। ডা. তাপস মন্ডল ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির শিশুরোগ বিভাগের কার্ডিওলজি ডিভিশনের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক।
অনুবাদ-সহায়তা করেছেন ডা. জয়ন্ত দাস, কলকাতার একটি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউটে সহযোগী অধ্যাপক।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র (বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়), বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন— ১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৮৪২০০৬৬৫৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

গল্প

ডা. প্রদীপ সরকার, এম বি বি এস

প্রদীপ সরকার

কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ছে। সামনের রাস্তায় কোমরডোবা জল। জল ভেঙেই দোকানবাজার, ছেলের টিউশানি সামলেছি। বৃষ্টিতে ভিজেও গিয়েছি কয়েকবার, গতকাল থেকে শুরু হয়েছে জ্বর। খুব দুর্বল লাগছে।

অসহ্য যন্ত্রণার চোটে কাল বিকাল থেকে চেম্বার খুলতে পারিনি। জেনারেল প্র্যাকটিস করি, মাসের শেষে মাইনে পাই না। রোজগার একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে চিন্তা হয়। শরীর খারাপ বলে ভোরের দিকে একটা কলও ফিরিয়ে দিতে হয়েছে। সে ঘটনার জেরে আজ সকালে আমার চেম্বার ভাঙচুর করা হয়েছে। আমাকেও মারবে বলে খুঁজছিল। পেলে নিশ্চয়ই ছেড়ে দিত না। যে ছেলেগুলি কাজটা করেছে তাদের আমি চিনি। পাড়াতেই থাকে, আমি কলে না যাবার জন্য তারা রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফেরার পথে ডাক্তারের চেম্বার ভাঙচুর করে তারা রাগ মিটিয়েছে।

ডাক্তার হিসাবে এ পাড়ায় আমার ইজ্জত কম। বর্ধিষ্ণু এলাকা, অনেকেই সরকারী চাকরি করে, নিতান্ত দায়ে না পড়লে অথবা বয়স্কা মা কি বিধবা পিসি, কাজের লোক ছাড়া পারতপক্ষে আমার কাছে কেউ আসে না। দিনকে দিন মাইনে বাড়ছে, বড় ডাক্তার না দেখালে সামাজিক মর্যাদাহানি হয়। কিন্তু বিপদের সময় পাড়ার ডাক্তার হয়েও রোগী দেখতে না যাওয়ার আস্পর্দ্ধা দেখানোয় তারা আমাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।

আমি ডাক্তার প্রদীপ সরকার, এমবিবিএস। ১৯৮৪ ব্যাচ, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছি। চাকরি না করে শুধুই প্র্যাকটিস কবি। প্র্যাকটিস তেমন জমে নি। সেজন্য মর্যাদা, প্রতিপত্তি, আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারিনি। পেশাদারী জগতেও তেমন কঙ্কে পাই না। সে দিন রক্তদানের এক অনুষ্ঠানে গিয়েছি, পাশে বসা রেলে চাকরি করা এক সিনিয়র ডাক্তার বললেন, চাকরি না নিয়ে তুমি খুব ভুল করেছ। আমি এখন দেড় লাখ টাকা মাইনে পাই। ২০১৪ তে রিটায়ার করব। পেনশন পাব প্রায় ৮০ হাজার। প্র্যাকটিস তো রয়েছেই। আমাকে শুনিয়েই বললেন বোধহয়। আমি অবশ্য অপমানিত হইনি। আমার কলেজেরই আর এক সিনিয়র দাদা কদিন পরেই প্র্যাকটিস ছেড়ে সুন্দরবনে কন্ট্র্যাক্ট সার্ভিসে জয়েন করল। কিন্তু পাকে চক্রে এমন জড়িয়ে পড়েছি আমি — বাইরে কোথাও ভাগ্য অন্বেষণের সুযোগও আর নেই।

ভাড়া করা খুপরি ঘরে চেম্বার। নেই নেই করে প্রায় ২০ বছর হয়ে গেলে প্র্যাকটিস করছি। এখনও চেম্বারে বসে কবিতা পড়ার ফুরসুত পাই। জোরাজুরির লেখা লিখি। নাওয়া-খাওয়ার সময় জুটবে না এমন প্র্যাকটিস জমার আর সম্ভাবনা নেই। আমার জন্য কোথাও পৃথিবীতে কোন আঁচড় থেকে যাবে না। কোন রাস্তা আমার নামে তৈরী হবে না। শ্বশুরবাড়িতে সাধ করে আমার মেয়ে বলতে পারবে না, 'কোন বাবার মেয়ে আমি' ইত্যাদি। আমার বউ ...

আমার বউ সুন্দরী, শাঁখাপলা পড়ে, কপালে সিঁদুর দেয়। তুলসিতলায় সন্ধ্যাবেলায় লালপাড় শাড়ি পরে শাঁখ বাজায়, সন্ধ্যা দেয়। শিবরাত্রির দিন উপোস করে থাকে। আমার মেলামেশার গন্ডির বিপ্লবী অংশটুকু শাঁখাপলা পড়া আমার বউ ঈশ্বর মানে বলে হাসাহাসি করে। তবুও আমার নরম স্বভাবের বউকে আমি খুব ভালবাসি।

প্রথম যে দিন মদ খেয়েছিলাম, মেডিকেল কলেজের থার্ড ইয়ার। অ্যানাটমি বিল্ডিংয়ের পাশের মাঠটার আলো আঁধারিতে সুরঞ্জনা আমাকে চুমু খেয়েছিল। শেষ যে দিন মদ খেয়েছিলাম, অমিত ও সুরঞ্জনাকে বাড়ি থেকে পাড়ার মোড় পর্যন্ত ছাড়তে গিয়ে কতকগুলো লোফার বাঁদরের টীকা টিপ্পনি, সিটি আর অশ্লীল মন্তব্য শুনেও প্রতিবাদ করতে পারিনি, মুখে মদের গন্ধ থাকায়। বদনাম হয়ে যাবার, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

আমাকে খুব ভালবাসে যে বউ, তাকে সুরঞ্জনার চুমু খাওয়ার কথা এখনও বলে উঠতে পারিনি। আমার প্রগতিশীল বন্ধুদের এবং আরো অনেকের বউকে লুকানোর মত আরও খারাপ অনেক ঘটনা আছে। অনেকেই চিকিৎসা ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িত, ওষুধ কোম্পানির টাকায় বাইরে বেড়াতে যায়, নার্সিংহোমের বা ডায়গনোস্টিক সেন্টারের কমিশন খায় ইত্যাদি। তারা যখন মদ খাওয়াকে, চুমু খাওয়াকে বা পুজো করাকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, দুর্নীতিমুক্ত সমাজের কথা, সমানাধিকারের কথা বলে তখন আমিও কথার পিঠে কথা বলি; কথোপকথনের পরম্পরায় আমার উচ্চারিত প্রত্যেক শব্দের পিছনে লুকিয়ে থাকে অনুচ্চারিত আরো অনেক ইতর শব্দ, অনেক গালাগালি। বলা-না বলা শব্দগুলো বোধ করি বোঝে আমি এদের পছন্দ করি না। আমার এইসব বন্ধুরা বোঝে না।

শ্যামবাজারের সাগ্নিক। সিঁথির মোড়ের সুজয় অথবা হাওড়ার মৈনাক। ছাত্রজীবনে এরা প্রত্যেকেই আমার চেয়ে নীরেস ছিল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ এই সব পেশাদারদের কারোর বিরুদ্ধেই আমার কোন বিদ্বেষ নেই। ওরা অবশ্য আমাকে চুনোপুঁটিই ভাবে। কেউ কারো সঙ্গে যোগাযোগ রাখি না। আমরা পরস্পরকে এড়িয়ে চলি, অতীত ঘুমিয়েই থাকুক।

বিদগ্ধ পাঠকদের কুর্নিশ। তাঁরা ঠিক ধরেছেন। এই লেখাটায় লেখক, নায়ক, পার্শ্বচরিত্রেরা বাস্তবের আলো-আবছায়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। পড়তে পড়তে ধৈর্যশীল যে ইন্টেলেকচুয়ালরা এতটা এগিয়ে এসেছেন তাঁরা যা ভাবছেন আমি তা অনেকদিন ধরেই জানি। লালুপ্রসাদের মত নেতা-নেত্রীদের সহ্য করেই মনমোহন সিংহদের নীতি নির্ধারণ করতে হয়, কেন না যাঁরা ভোটে জিততে পারেন তাঁরা মনমোহন নন। চক্রধর চ্যাটার্জীও যেমন একথা জানে যে তিনকড়ির বউ কুৎসিৎ বলেই সৎ ছেলে মেয়ে, ভাগ্নে ভাগ্নিদের নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছে।

পুলিশ অফিসার সলিল মন্ডল, ধোপধুরস্ত ইউনিফর্মে রাশভারি ব্যক্তিত্ব, মাঝবয়সী, সুদর্শন, ভাঙা স্ফিগমোম্যানোমিটারের পারদ সাবধানে পাশ

কাটিয়ে আন্তরিক ভাবে বললেন— ডাক্তারবাবু, আমি সত্যি খুব দুঃখিত, ছিঃ ছিঃ, আজকালকার ছেলেপুলেরা ডাক্তার-মাস্টারকেও সম্মান করতে শেখেনি। চিন্তা করবেন না, আমার তরফ থেকে অ্যাকশন নিতে দেরি হবে না। নামগুলো বলুন — এখুনি তুলে নিচ্ছি।

ভিড় থেকে কেউ আওয়াজ তুললো, সরকারের টাকায় ডাক্তার হবে, অথচ বিপদের সময় ডাকলে যাবে না? বলছে ডাক্তার অসুস্থ। ন্যাকাচৈতন্য! অসুস্থ হলে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে কি করে?

এলাকার প্রাক্তন মেয়র ব্লাডপ্রেশার দেখাতে মাঝেমধ্যে আমাকে বাড়িতে ডেকে নেন। দোহারা গড়ন, মস্ত টাক। দিন বদল হলেও এখনও তিনিই এলাকার অভিভাবক। জনতাকে সামলে রাখার ভঙ্গিতে হাত তুলে হুঙ্কার দিলেন— চুপ কর তোমরা। আমার কাছে এসে আপনজনের মত কাঁধে হাত দিয়ে গলা নামিয়ে বললেন — কথা দিচ্ছি ডাক্তার, পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াবো, ঘাড় ধরে ড্যামারেজ আদায় করে দেব। সমাজের কলঙ্ক, আজ তোমাকে করছে, কাল হয়তো আমার উপরেই চড়াও হবে। সহ্য করা যায় না।

প্রাক্তন মেয়রবাবুর ভাইপো আমার ছেলের সখের অ্যাকোরিয়ামটা আছড়ে ভেঙেছে। দু চারটে ছোট জলজ প্রাণীর লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

এ লেখার নাম মা, মাটি, মানুষ রাখতে পারলে বেশ হত। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, বেগম খালেদা জিয়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই তিন শব্দের ক্যাচলাইন ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছেন। হতে তো পারে প্রকাশ হবার পর কোন পাঠক লেখাটির প্রশংসা করে সম্পাদকের কাছে চিঠি পাঠালেন, নামটা রাখা হল না বলে সেটা হবার উপায় নেই।

মানুষ হিসাবে, একজন সৎ, নীতিপরায়ণ, আদর্শবাদী, এথিক্যাল, লিগ্যাল, লজিক্যাল মানুষ হিসাবে থাকতে হলে নিম্নবিত্ত হয়েই থাকতে হবে, বড় প্র্যাকটিস বানাতে গেলে মরালিটির কোথাও না কোথাও, লজিকের কোথাও না কোথাও, এথিক্সের কোথাও না কোথাও, আইনের কোথাও না কোথাও, আইডিয়ালিজমের কোথাও না কোথাও, অনেস্টির কোথাও না কোথাও— আপস করতেই হবে। ইগোর সঙ্গে কোথাও না কোথাও যুদ্ধ করতে হবে।

ধরা যাক বৃদ্ধা মাকে বিনা চিকিৎসায় দিনের পর দিন ফেলে রেখে, তারপর যখন অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘটবে তখন পাড়াশুদ্ধু লোকজন, যারা মুমূর্ষু মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চিকিৎসার ব্যাপারে কোনও সাহায্য করলো না, অবহেলা করে মর্যাদাহীন মেরে ফেলাটা পরোক্ষ সমর্থন করল, ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য ডাক্তারের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রাজনীতিকরা, পুলিশ তাদেরই সমর্থন করবে, যেন নিয়মনিষ্ঠ থাকাটাই অপরাধ। ডাক্তার যদি বে-আইনি কাজ না করার ব্যাপারে একগুঁয়ে হন ভাগ্যে অসম্মানকর কোন কিছু জুটবেই এবং অন্য ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দেবেন। যেমন ধরুন সাতদিন বা একমাস অফিস না যাওয়ার পর যদি কোন রোগী 'অসুস্থতার জন্য অফিস যেতে পারেনি'—ডাক্তারের কাছে এমন মিথ্যা সার্টিফিকেট চায় এবং কোন ডাক্তার যদি সেটা না দেন তবে এ সার্টিফিকেট দেবার ডাক্তারের অভাব হবে না। বড় ডাক্তারবাবুর কাছে একমাস চিকিৎসা করিয়ে মোটা ফি দেবার ভয়ে অথবা অন্য কত কারণে কতবার কত লোক যে আমার কাছে সার্টিফিকেট নিতে আসেন।

এই যে আমার ভাঙা চেম্বারের সামনে এত ভিড়, এই ভিড়ের মধ্যে এরকম আশাহত অনেকে আছেন— প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঘা তাদের এখনো শুকায়নি। প্রতিবেশী বিপদে পড়লে, বিশেষত আমার মত তেঁএটে প্রতিবেশী, বাঙালি খুব খুশি হয়। দ্যাখ কেমন লাগে, শ্-শালা। দলবদ্ধ থাকলে গলার জোর বাড়ে। ওরা আমার ক্ষতস্থান খুঁচিয়ে ঘা করতে চায়।

আমার হয়ে গলা ফাটাবার কেউ নেই। আমার কোন দল নেই। তাই আমার কোন স্বর নেই।যে রোগী হিসাবে কোনদিন আপনার কাছে আসে নি, সে বড় ডাক্তারের লেখা ওষুধের সাবস্টিটিউট খুঁজতে আপনার কাছে আসতেই পারে। বা হাতের লেখা বুঝতে বা ওষুধটা কেমন করে ব্যবহার করতে হবে। হাসিমুখে এ সব সামলাতে পারলে কিছু লোক আপনাকে সাপোর্ট করতে পারে। ওষুধের দোকানের এক্সপায়ার্ড হতে যাওয়া ওষুধের লিস্ট আপনার কাছে এলে আপনাকে প্রেসক্রিপশন সুযোগ মত লিখে দিতে হবে, পলিক্লিনিকে আপনার সঙ্গে নামকরা ডাক্তারবাবুর সময় ম্যাচ করছে না, আপনার সময়ে চেম্বার আলো করে রাখবেন উনি, টিঁকে থাকতেহলে আপনাকে অন্য সময় বেছে নিতে হবে। এরকম পারলে আপনিও দলবদ্ধ থাকবেন।

ডায়াগনস্টিক সেন্টার কমিশন দেয়, আপনি নীতিনিষ্ঠ, কমিশন নেবেন না, রোগী রেফার করে কাটমানি নেবেন না, নার্সিংহোমের সঙ্গে কোন ব্যবস্থা করবেন না — তো আপনার টাকা রোগীকে ছাড় দিয়ে দেওয়া হবে তো? না, আপনার ন্যায়পরায়ণতা মালিকপক্ষকে সুবিধা দেবে। বরং এই টাকা নিলে দলে কিছু লোক পাবেন। অনুপস্থিত রোগীর হয়ে সতীপনা করলে কার কি লাভ! অতএব, বুদ্ধিমান না হলে তুমিই ফাঁদে পড়বে। একা।

যদি কেউ ভেবে থাকেন এ রকম পরিচ্ছন্ন থাকার কোন সুবিধা আছে— ভুল, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ সবের কোন মূল্য নেই। রোগীরা জানবে না, আর জানলেও আলাদা কোনও গুরুত্ব দেবে না।

এভাবে চলছি দেখে কেউ যদি ভাবেন আমি নির্লোভ, সংসারে থাকা সন্ন্যাসী— সেটাও ভুল। আমি ন্যায়নিষ্ঠ থেকে রোজগার করতে চেয়েছি। সেটা সম্ভব হয়নি। পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল। আগের মত ধক আমার নেই, শরীরটাও বুড়িয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্তের রোজগার অথচ বাজারের দোকানী, মায় রিক্সাওয়ালা সব ডাক্তারবাবু বলেই বেশি পয়সা আশা করে। সুন্দরী বউ এখন জেল্লা হারিয়েছে। মেয়েটা পড়াশোনায় খুব ভাল নয়। ক্যাপিটেশন ফি জোগাড় করতে পারি নি বলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ওর হল না, ইংরেজি অনার্স পড়ছে।

এ গল্পটার শেষ করব কি করে সেটা ভেবে পাচ্ছি না। ভেঙেচুরে যাওয়া এক মানুষের সরীসৃপ দিন কাটানোর বর্ণনায় কোন মোচড় থাকে না। এ গল্পের পাঠক পাব কোথায়? লেখক আমি আর গল্পের নায়ক আমি এবার মিলে যাচ্ছি। আমরা এবার আষ্টেপৃষ্ঠে রমন করব। কামনা বেদনায় মিশে যাবে তৃপ্তির উচ্ছাস। এক আমি আর এক আমির ঠোঁটে চুমু খাক, আদরে সরিয়ে দেব কপালের অবিন্যস্ত চুল। তার চোখের জলে ভিজে উঠব। তারপর পাব্লিকের পেছনে, নেতার টাকে আর পুলিশের ইউনিফর্মে ...।

যে ভঙ্গিতে পাড়ার খেয়ো কুকুরটা লেজ নাড়তে নাড়তে রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া বিস্কুট খায়, মৃদু হেসে অবিকল সেরকম মুখভঙ্গি করে বললাম — থাক থাক, ছেলেরা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছে। পাড়ায় ছেলে, বিপদে আপদে ওরাই দেখবে, ও আমি মিটিয়ে নেব 'খন।

আমি ডা. প্রদীপ সরকার এমবিবিএস আমার ভেঙে যাওয়া চেম্বারে নিজেকে ভেঙে ফেললাম।